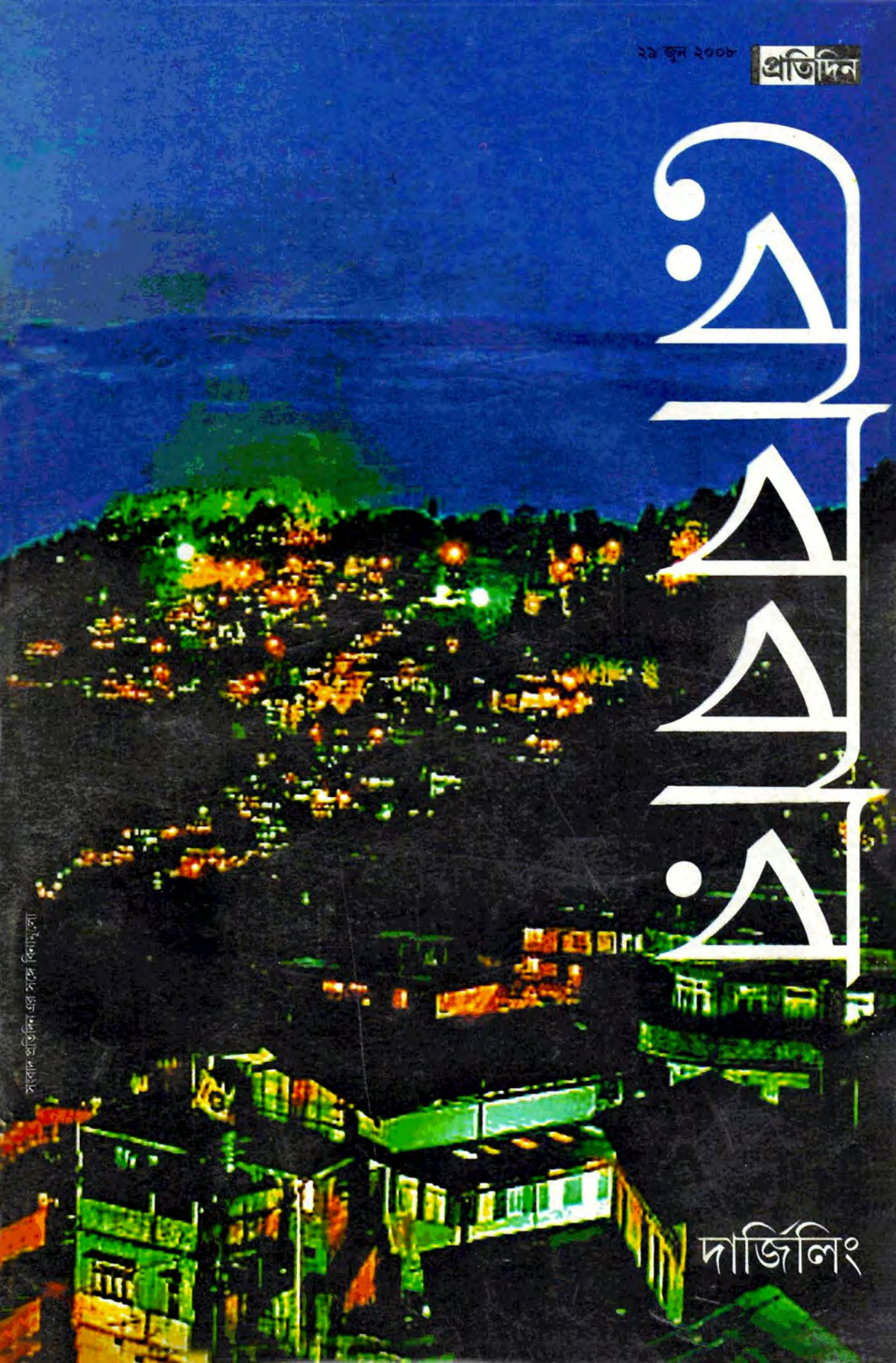

২৯ জুন ২০০৮
প্রতিদিন
রবিবার
দার্জিলিং
সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

রথেররশিতেপড়লটান
গয়নাকিনেপুরীযান।

রথযাত্রায় কিনুন গয়না,

- জিতে নিন ৩ দিন, ২ রাত পুরী বা মায়াপুর বেড়ানোর প্যাকেজ !!

এছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন গিফট্ ভাউচার জেতার সুযোগ।

গয়নার মজুরীর উপর ৫০% অবধি ছাড়-ও রয়েছে !!

অঞ্জলি জুয়েলার্স®

সবার জন্য

শুধুমাত্র
৪-১২ জুলাই
২০০৮

গোলপার্ক - ২৮এ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা ২৯, ফোন : ২৪৪০ ১৭৯২/২৪৬০ ০৫৮১
শোভাবাজার - ৩৮ অরবিন্দ সরণী, শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের পাশে, কলকাতা ৫, ফোন : ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪
সল্টলেক - বি. ই. ১০১, কোয়ালিটি মোড়, কলকাতা ৬৪, ফোন : ২৩২১ ২০৫৭/২৭৮৬
সল্টলেক - এইচ. এ. ৩, জিডি আইল্যান্ডের পাশে, কলকাতা ৯৭, ফোন : ২৩২১ ৮৩১০/১১
বেহালা - ৫২২সি ডায়মন্ডহারবার রোড, স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে, কলকাতা ৩৪, ফোন : ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই।

রবিবার, ৬ই জুলাই দোকান খোলা থাকবে।

www.anjali.bz

দোকান সকাল ১০.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত খোলা।

রোববার

১৪ জুন ২০০৯

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

লেটারবক্স

পাঠকের পাতা ৪

ফার্স্ট পার্সন

ঋতুপর্ণ ঘোষ ৬

বাংলার মুখ

ভালো-বাসার বারান্দা
নবনীতা দেবসেন ১০

এবার মলাট

দার্জিলিং

আমার দার্জ
অঞ্জন দত্ত ১২

একটা পাহাড়
যাকে কেউ বুঝতে চাইল না
শুদ্ধব্রত দেব ১৬

শীতে উপেক্ষিতা
রঞ্জন ২০

গোসাঁইবাগান

জয় গোস্বামী ২৪

বাংলার মুখ

পথের পাঁচালি
জয়া মিত্র ২৮

রোববারের রামপ্রসাদী

আয় মন বেড়াতে যাবি
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৩০

রোববারের গল্প

ঝিলডাঙার কন্যা
প্রচেত গুপ্ত ৩৪

সেন সলিউশনস

রাইমা সেন ৩৮

রান্নাঘরে রেস্তোরাঁ

অক্সফোর্ড বুক স্টোর-এর
চা-বার ৪০

সৌজন্যে
নিউ এজ

টিম রোববার

গীতিষা দাশগুপ্ত
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা বসু
প্রসূন চক্রবর্তী
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী
বিপুল গুহ
রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার
শান্তনু দে
সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

Rediffusion | DYR/Kol/SG/172

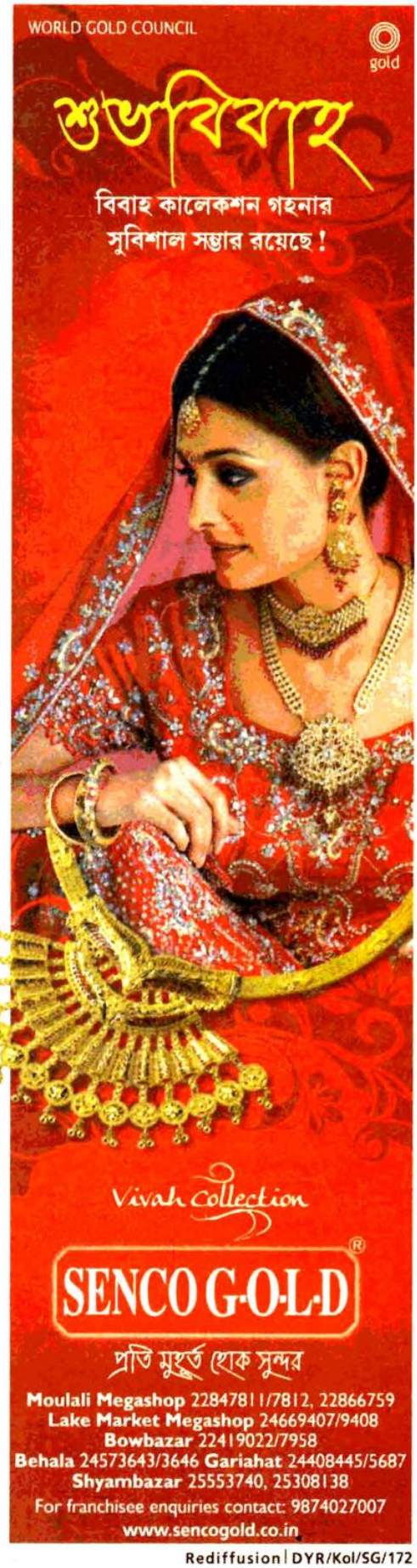

বাঁশিওলা বাজাও বাঁশি দেখি না তোমায়

প্রেম এক অমোঘ শব্দ। এই শব্দের বিশালতা, ক্ষমতা, মায়া—বোঝবার মতো জ্ঞান বোধহয় আমাদের নেই! 'বাঁশিওলা' রচনাটিতে শ্রীজাতর কাছে পেলাম, ব্যর্থ প্রেমের সংজ্ঞা। চোখ বুজলে যে গানটি তাঁর মনে পড়ে, যে আবছা ছবিটি তাঁর মনের মধ্যে ফুটে ওঠে, ব্যর্থ প্রেমের সেই প্রথম দৃশ্যটিকে বড় সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন তিনি।

'হারিয়ে ফেলার যে বেদনা, না পাওয়ার যে শূন্যতা, তার জন্যে মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণবোধ কাজ করে। বুঝে হোক, না বুঝে হোক, কাজ করে।' সত্যিই অপূর্ব লিখেছেন তিনি। যুগ যুগ ধরে ব্যর্থ প্রেমই শিল্পে, সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে প্রবলভাবে সফল, শ্রীজাত যাকে বলেছেন, গ্লোরিফায়েড। জটিল শোনালেও, বাস্তবটাকে তিনি তুলে ধরেছেন এইভাবে—'প্রেমের ব্যর্থতার মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে তার সফলতা আর প্রেমের সফলতা কোথাও গিয়ে যেন এক ধরনের ব্যর্থতাই'

'ভ্যালেন্টাইনস ডে' সম্পর্কে লিখেছেন, প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে এই দিনটি হল, তাদের সিদ্ধান্তকে মর্যাদা জানাবার দিন। তবে ইদানীংকালে আমাদের দেশে, এই নতুন উৎসবের দিনটিকে নিয়ে যে আদিখ্যেতা হয়, বিশেষত কমবয়সি মহলে, তা আমার নিজের তেমন একটা ভাল লাগে না। তবে এর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীজাত অপূর্ব লিখেছেন—'এত যে আয়োজন, তার মধ্যে কোথাও ব্যর্থ প্রেমের জায়গা নেই কেন?' 'কেন শুধুই 'সফল' প্রেমের স্তুতি? তারপর বুঝি, কেবল সফলতার জন্যেই রাখা হয়েছে এই একটা দিন।' 'বছরের বাকি ৩৬৪ দিন আমরা কোথাও না কোথাও প্রেমের ব্যর্থতাকে উদ্‌যাপন করি, ব্যর্থ প্রেমের বেলুন ওড়াই।'

শ্রীজাত আপনাকে, আপনার লেখাকে শুভেচ্ছা জানাই, শুধু এই লিখবার জন্যই যে—'ভেঙে পড়া মানুষের দুঃখের প্রতি যে সমবেদনা, ধাক্কা খেয়ে চোখের জল মুছে আবার উঠে দাঁড়ানো মানুষের প্রতি যে স্যালুট, তার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য।' একেবারে আমার মনের কথাগুলো লিখে দিয়েছেন, আপনি।

সবশেষে বলি, ১৫ নম্বর পাতার ফটোগ্রাফটি, এই লেখার সঙ্গে ঠিক মানায়নি। তবে ১৩ নম্বর পাতার মধুবনি ছবিটি দারুণ সংগ্রহ। শ্রীজাতকে আরেকবার প্রশ্ন করি—প্রেমের আসল নাম কি তবে ব্যর্থতা, নাকি ব্যর্থতাই হল প্রকৃত প্রেম?

ভাস্কর দত্ত

নামকরণের সার্থকতা

শ্রীজাতর লেখা 'বাঁশিওলা' রচনাটি অনবদ্য। যে বাঁশি মানবজীবনে প্রেমের ডাক দেয়, সেই বাঁশিই আবার প্রেমে বিরহের ব্যথা হয়ে, মানবজীবনে থেকে যায়। বাঁশিই জানিয়ে দেয়, খেলা শুরু আর শেষের ক্ষণ। কবি, সাহিত্যিক, কাব্যকাররা, সেইজন্যই বোধহয় তাঁদের আনন্দ, ব্যথা, বেদনাকে জানান দিতে বাঁশিকে সঠিক মানে আশ্রয় মনে করেন। সৃজনশীল মানুষ মাত্রই বাঁশিকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নভঙ্গ হলেও বাঁশিকে ত্যাগ করে না। বাঁশির জয় এখানেই। সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ, শুধু কাব্যপ্রিয় হলে চলবে না, ইতিহাসপ্রিয় পাঠকের কথাও ভাবতে হবে। এই সংখ্যায় বাঁশির ব্যাকরণ, রূপভেদ, পৌরাণিকতা থাকলে নামকরণের সার্থকতা, পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকত।

পল্টু ভট্টাচার্য

নানা রূপে বাঁশি

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে বাঁশি কৃষ্ণ বাজিয়েছিলেন, বৈষ্ণবকাব্যে মিলন-বিরহের চিরন্তন আঙিনায়, শ্রীরাধা সে বাঁশির শাশ্বত প্রেমিকা। রবীন্দ্রকাব্যে বিচিত্র হৃদয়মূর্তির মূর্ছনায় সে বাঁশি বেজে গিয়েছে কখনও করুণ সুরে, কখনও মিলনের আকাঙ্ক্ষায়। দূরদেশি সেই রাখাল, বটের ছায়ায় যে সুর বাজায়, তার অনুরণন থেকে যায় হৃদয়ে। বাঁশি কত নামে বাজে—বাঁশরি, মুরলি, বেণু, অভ্রবাঁশি, বাঁশের বাঁশি, ফ্লুট ইত্যাদি। বাজাবার ভঙ্গিও তার বিচিত্র। তবে মোহনবাঁশি বাঁকা শ্যামের বাঁকা ভঙ্গিমায় আজও স্মরণীয়।

'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই'—শচীনকর্তার অমোঘ গীতিতে বাস্তব সত্যটা আজ আমাদের জীবনে চিত্রায়িত। বাঁশির বদলে ছোট এক যন্ত্রের 'রিংটোন' সারাদিনরাত সব বয়সের খোকাখুকুদের হাতে রাখা মোবাইলে বাজছে। তাই বোধহয় 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' আর পৌঁছায় না। মুহূর্তের প্রেম, মুহূর্তেই পালায়। দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘায়িত হয় না, ল্যাটা যায় চুকে। সারাজীবনের অশ্রু, বসুধারা হয়ে ফল্গু নদীর মতো অন্তঃসলিলা হয় না। 'বাঁশি' সংখ্যাটি যেন ভুলে যাওয়া কিছু স্মৃতিকে, নতুন করে মনে করিয়ে দিল।

ঝর্ণা ঘোষ

অন্তহীন আশ্রয়

'বাঁশি' তুলনাহীন একটি ব্যতিক্রমী সংখ্যা। ভারতের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে, একটি হল বাঁশি, যার অনুরণন নিখুঁত নিশানা দেয়, বৈভব দেয়, ইচ্ছে হলেও

হতাশ হতে দেয় না। গোটা সংখ্যায় কয়েকটি লাইন, হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে। 'ফার্স্ট পার্সন'-এ, 'যেন এই বাঁশিই মুক্তি দেবে তাকে।' 'বাঁশিওলা'-তে, 'ওঁর বেপরোয়া বাঁশি আর কান্না সহ্য করতে হচ্ছে আমার বন্ধুকে।' আবার 'জলঝারি'-তে. 'সে বাঁশি কোথায় আছে, কার কোন ভালবাসা-ঘরে?' আর 'আহা! আজি এ বসন্তে'-তে 'রিংটোনে মধুর বাঁশরি ধ্বনি বাজিয়া উঠিল ফের।'—সত্যি সত্যি বাঁশির মোহময় জয়জয়কার, প্রাপ্তির ঘর পূর্ণ ও পুণ্য করে, উজ্জ্বল আচ্ছাদনে।

বাঁশির পরশ মুগ্ধ করে সত্তাকে, ছন্দে চেতনা আনে, ইচ্ছে জবরদস্ত করে, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে, নিজস্বতাকে মোহিত করে। ঘটনা এই—বাঁশির নিবিড় সান্নিধ্য বশ করে হৃদয়ের পংক্তি, আর তার চড়াই-উতরাই পথ নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটায়, অন্তহীন আশ্রয়ে।

অরুণাশিস মুখোপাধ্যায় কলকাতা

কৃত্রিম খোলস

'বাঁশি' হৃদয়ে রচনা করল, এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতি। যার প্রভাবে নেচে উঠল মন। কৃষ্ণের বাঁশির ডাক, পাগল করেছিল রাধাকে, আর রোববার-এর বাঁশির ডাক চঞ্চল করল হৃদয়কে। কৃষ্ণের বাঁশি যেমন রাঙিয়ে দিয়েছিল রাধার মন, আমি জানি এমন এক রাধার কথা, যে সামাজিক সকল বাধা অতিক্রম করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন সফল করেছে। আমাদের রাধা, মানে আধুনিক মেয়েটির অনেক গুণ। ভাল গান জানে, ভাল ছবি আঁকে, আর পড়াশোনাতেও দুর্দান্ত। সে ভালবাসল এমন এক ছেলেকে, যার কোনও চালচুলো নেই। ছেলেটির গুণ বলতে, তার আশ্চর্য সুন্দর চোখ দু'টি, আর মিষ্টি কথা বলতে পারে। আধুনিক শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্তা একটি মেয়ে, একটি বেকার ছেলেকে বিয়ে করার যে সাহস দেখাল, তা কিন্তু পৌরাণিক রাধার স্বামীর ঘর ছেড়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার দুঃসাহস থেকে কম নয়।

আসলে, বাঁশি হল সেই ভালবাসা, যার টানে শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, পিছনে পড়ে থাকে সব আর্থিক নিরাপত্তার বলয়, মান-সম্মানের কৃত্রিম খোলস।

বিজন মজুমদার উত্তর ২৪ পরগনা

জ্বলন্ত প্রতিভাস

'বাঁশি' সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে অনবদ্য 'ফার্স্ট পার্সন'-এ বংশীবাদক অপুকে তুলে ধরেছেন, সম্পাদক মহাশয়। সেই নস্ট্যালজিয়ার 'অপুর সংসার' নামক সেলুলয়েডে বিভূতিভূষণের অপু, চিরকালীন বন্দি। বহুকাল ধরে সেই দৃশ্য আজও জারিত হয়ে আছে, বাঙালির স্মৃতিতে ও মননে। সত্যজিৎ ও বিভূতিভূষণ যুগলের অভাবনীয় সার্থক অমর সৃষ্টি। বাঁশির ধ্বনি যুগ যুগ ধরে মানুষকে এক আশ্চর্য আনন্দলোকে পৌঁছে দেয়, ভুলিয়ে দেয় সমস্ত রকমের দুঃখ ও যন্ত্রণা। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাঁশির সুরে পৃথিবীকে মোহিত করেছেন। শ্রীজাতর লেখা 'বাঁশিওলা' এক ভিন্ন স্বাদের রচনা। সফল প্রেম ও ব্যর্থ প্রেম নিয়ে অতি সুন্দর ব্যঞ্জনা করেছেন, তাঁর সাবলীল লেখনীতে। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা ভুলতে গিয়ে একজন ভদ্রলোক বাঁশিকে আপন করে নিয়েছেন।

সফল প্রেমিক একটা সময়ের বৃত্তে বাঁশি ধরেছেন। মনে পড়ে, সেই ষাট ও সত্তরের দশকে বাঁশি নিয়ে কত ধরনের গান সৃষ্টি হয়েছিল। পুরনো সেই গানগুলো এখনও মনের মাঝে গুঞ্জরিত হয়।

প্রচেত গুপ্ত তাঁর লেখা, 'আহা! আজি এ বসন্তে'র মাধ্যমে এক নতুনতর আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। খুবই সুন্দর ও প্রাঞ্জল প্রেমের রূপটির, সেই দ্বাপর যুগ থেকে আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর সঠিক সার্থক মূল্যায়ন করেছেন। আধুনিকা রাধার মোবাইলের রিংটোনে বাঁশরি ধ্বনির সুর খুঁজে পেয়েছেন, লেখক। অতি সুনিপুণ ভাবগম্ভীর মিষ্টি মূর্ছনার জ্বলন্ত প্রতিভাস।

অপূর্বকৃষ্ণ দাস দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নোবেল প্রাপ্তি

'ভালো-বাসার বারান্দা'য় নবনীতা দেবসেনের 'রেচেলের আশ্চর্য গল্প' পড়লাম। ভাল লাগল। আসলে প্রত্যেক লেখক-লেখিকার, তাঁর যে কোনও লেখার প্রতি একটা বাৎসল্য, একটা মমতা থাকে। আর সেই লেখার সূত্রে তার জন্মদাতাকে যদি কেউ মনে রাখে, এবং সেটা প্রকাশ পায়, তাহলে তার মতো আনন্দ আর কিছুতে হয় না। নবনীতার ঠিক তাই হয়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, খবরের কাগজের পাতায় কয়েক ছত্রের একটি চিঠি প্রকাশ পাওয়ার পর, অন্য একটি ছোট পত্রিকার সম্পাদক যখন উপযাজক হয়ে বাড়ি এসে আলাপ করেন, প্রশংসা জানান, তখন মনে হয়, এ আমার 'নোবেল' প্রাপ্তি!

গোবিন্দ মতিলাল কলকাতা

চিঠি পাঠাবার ঠিকানা
লেটার বক্স, রোববার
সংবাদ প্রতিদিন
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭২
robbar.pratidin@gmail.com
Fax 22127977

এক

কলকাতায় প্রথম যখন ফোন করে অলোক রাজ, জেরুজালেম-এর দ্রষ্টব্য নানা কিছুর মধ্যে বারবার হলোকস্ট মিউজিয়ম-এর নামটা ফিরে আসছিল, আমি সত্যিই অতটা মন দিয়ে খেয়াল করিনি।

আমার দর্শন তালিকায় এর পর হলোকস্ট মিউজিয়ম রয়েছে শুনে এবার একটু মনোযোগী হলাম।

মহাযুদ্ধের সময় হিটলার-এর নেতৃত্বে যে বিশাল ইহুদি নিধনযজ্ঞ হয়েছিল, তারই ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে নানা স্মারক, ছবি, উদ্ধৃতি, ফিল্ম-এর অংশবিশেষ দিয়ে তৈরি এই মিউজিয়ম।

আমার এ ধরনের মিউজিয়ম দেখলে খুব মনখারাপ হয়ে যায়, তারপর সারা দিনটা কেমন যেন একটা বিশ্রী অবসাদের মধ্যে কাটে। ফলে, আমার আর এই মৃত্যুর মিউজিয়ম দেখতে তেমন ইচ্ছে করছিল না।

একবার লন্ডন-এ ব্রিটিশ মিউজিয়ম দেখতে গিয়েছিলাম মনে আছে। আমি আমার বন্ধু সঙ্গীতা আর শৌমিল্যদের বাড়িতে ছিলাম। সঙ্গীতা, মানে বুবু, আমাকে মিউজিয়ম-এর সামনে নামিয়ে দিয়ে নিজের কাজে এগিয়ে গেল।

আমার ইচ্ছে ছিল, সারাটা দিন মিউজিয়মেই কাটাব।

মিশরের বিভাগটায় কত কিছু দেখার আছে। আর আমার যেহেতু বরাবরই প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে আলাদা একটা আগ্রহ, আমি প্রথমেই মিশরের বিভাগটাতে ঢুকলাম। তখন বেলা এগারোটা হবে।

মন দিয়ে দেখছি। কত মামির সারি, রাজাদের পোষা বেড়াল, বাজপাখি, কাকাতুয়া—তাদেরও মামি। তার ছোট্ট কফিন, তেমনই যত্ন করে ছবি আঁকা, নক্সা কাটা।

বেলা তিনটের সময় শরীরটা কেমন যেন আনচান করতে লাগল। কেমন একটা ঝিমঝিমে গা-বমি বমি ভাব।

ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম, টানা অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ ঘরের মধ্যে আছি, হয়তো তাই শরীরটা খারাপ লাগছে। বাইরের হাওয়ায় গেলে ঠিক হয়ে যাবে।

বাইরে এসে মিউজিয়ম-এর সিঁড়ির ধাপে বসেছি। বাইরে লোক চলাচল করছে। রাস্তায় চলন্ত গাড়ি, কোনও একটা স্কুল থেকে অনেক বাচ্চা এসেছে মিউজিয়ম দেখতে—তাদের টুকটুকে লাল সোয়েটার ছেয়ে আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ম-এর চাতাল।

আমি ওখানে, ওই সিঁড়িতে বসেই, হড়হড় করে বমি করে ফেললাম।

নিজেও বুঝিনি, এতক্ষণ পুরনো সভ্যতা দেখার লোভে, এত জীবন্ত শবদেহাঘরের মধ্যে থাকতে থাকতে মৃত্যু, নাকি মৃত্যুর অভিঘাত, এসে আচ্ছন্ন করছিল শরীর-মন। ভেতরের থেকে বেরিয়ে আসাতে, বাইরের জীবনের স্পর্শ যেন সেই অবসাদকে বেরনোর পথ করে দিল। মৃণালদার(সেন) 'একদিন প্রতিদিন' ছবির দৃশ্যটা জ্যান্ত হয়ে ফিরে এল চোখের সামনে—যেখানে নিখোঁজ মেয়েটির দাদা মর্গে গিয়ে অনেক মৃতদেহ দেখার পর বাইরে এসে বমি করে ফেলে।

পুরনো সেই অভিজ্ঞতার কারণেই একটু অস্বস্তি হচ্ছিল আবার একটা মৃত্যুর দেশে গিয়ে পৌঁছতে। মৃদু একটা আপত্তি করলাম।

—না, হলোকস্ট মিউজিয়মটা বাদ দিই। আমরা নয় গ্যালিলি উপত্যকাটা দেখে নিই না। আপাতত একটা ইতিহাসের মধ্যে আছি।

বেশ কড়া উত্তর এল আভিভার কাছ থেকে,

—কেন, হলোকস্ট-টা কি ইতিহাস নয়?

—হ্যাঁ সে তো বটেই! কিন্তু...

—কিন্তু কীসের? যিশুর মৃত্যুটা ইতিহাস, আর হলোকস্ট ইতিহাস নয়?

এবার একটু রাগই হল আমার।

—আমি তো সেকথা বলিনি। কিন্তু আমি কোন ইতিহাসটা দেখব, সেটা তো আমার ব্যাপার।

কোনও সদুত্তর এল না। কিছুক্ষণ পর ফোন এল অলোক রাজ-এর।

—তুমি নাকি হলোকস্ট মিউজিয়ম দেখবে না বলেছ?

—হ্যাঁ। কেন বলো তো?

টেলিফোনের ওপাশে অলোক রাজ-এর আমতা আমতা,

—পনেরো মিনিট একটু ঘুরে যাও না। সব ব্যবস্থা করা আছে। ওখানে একজন অপেক্ষা করছেন তোমার জন্য।

—আমি তো কোনওদিন বলিনি যে, আমি হলোকস্ট মিউজিয়ম দেখতে চাই। তাহলে আমার জন্য কাউকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার মানেটা কী?

অলোক এবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ধীরে ধীরে বলল,

—আসলে কী জানো? এটা তো একটা ডিপ্লোম্যাটিক ভিজিট। আর ইজরায়েল-এর মানুষরা এই হলোকস্ট মিউজিয়ম নিয়ে একটু বেশি সেনসিটিভ। ফলে তুমি যদি একেবারে না যাও, তাহলে হয়তো ওদের একটু খারাপ লাগবে।

আমি তর্কটাকে সহজেই এই বলে বাড়াতে পারতাম যে, আমি কোনও 'ডিপ্লোম্যাটিক ভিজিট'-এ আসিনি। আমি একজন ছবি-করিয়ে, আমি আমার ছবি নিয়ে এসেছি এদেশে। আর কোনও দেশ আমাকে ঠিক করে দিতে পারে না যে, আমি আমার ভ্রমণের আনন্দ তার

זוכרים את העבר, מבטיחים את העתיד

REMEMBERING THE PAST, SHAPING THE FUTURE

50

יובל יד ושם

YAD VASHEM

50TH ANNIVERSARY

পঞ্চাশ বছরের ক্রোদ; য়াদ ভাশেম পরিচয় পত্রিকা

দেশের কোন জায়গা থেকে আহরণ করব...ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু মনে হল, থাক! এটা নিয়ে আর কথা না বাড়ানোই ভাল। বললাম,

—ঠিক আছে, যাচ্ছি, ওঁদের বলে দাও। তবে, আমার ভাল না লাগলে আমি চলে আসব, ওঁরা যেন কিছু মনে না করেন।

ফোন শেষ করে হোটেল লবিতে পা রাখতেই দেখি মুখ শুকনো করে বসে আছে মোটি, আমার সেই গাইড মোটি রাস। আমি বললাম,

—চলো।

শুকনো গলায় মোটি জিগ্যেস করল,

—কী? ডেড সি?

—না। হলোকস্ট মিউজিয়ম। তাই তো কথা হল। মোটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল নিমেষে,

—দাঁড়াও। একটা ফোন করে ট্যাক্সিটা ডেকে নিই।

দুই

শ্রাবণ মধ্যাহ্নের রোদে ট্যাক্সিটা এসে থামল একটা বিশাল ছড়ানো আধুনিক নক্সার বাড়ির কাছে।

বাড়ির স্থাপত্যকল্পনার মধ্যে একটা সংযত, শীলিত প্রসারতা আছে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, কোনও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষ। বা, আরও ছড়ানো কোনও একটা ছাত্র সম্মিলনাগার।

মিউজিয়ম কথাটা বললেই আমরা কলকাতার জাদুঘর থেকে শুরু করে সর্বত্রই কেমন যেন বিশাল বিশাল থাম আর অতিকায় করিডর সম্বলিত বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ি বুঝি, এটা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

মিউজিয়মটার নাম য়াদ ভাশেম (Yad Vashem)। য়াদ কথাটা আমাদের চেনা। উর্দু 'ইয়াদ'-এরই সমার্থক—স্মৃতি। 'ভা' মানে এবং। 'শেম' হল নাম।

পোল্যান্ডের অস্টউইশ্চ-এর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ছারপোকার মতো মারা গিয়েছিল কত অগুন্তি নামহীন ইহুদি মানুষ—য়াদ ভাশেম, এই অনামী মানুষগুলির যতটা বিশদভাবে পারা যায়, ছবি সংগ্রহ করেছে। এবং কেউ না কেউ পরবর্তীকালে চেষ্টা করে সেই ছবিগুলো থেকে বার করেছে নিহতদের নাম, পরিচয় বা আরও অন্যান্য তথ্যসূত্র।

প্রধান চত্বরটার নাম Hall of Names। ১,১০,০০০-এর বেশি ছবি, চিরকুট, চিঠি, বা সেই কুখ্যাত নিধনযজ্ঞ সম্পৃক্ত অন্য কোনও ব্যক্তিগত স্মৃতি সম্ভারই কেবল এই সংগ্রহশালায় দ্রষ্টব্য।

বুঝতে পারলাম, আমার গত দু-তিন দিনের পরিচিত সমগ্র জেরুজালেম কেন আমাকে প্রায় জোর করে পাঠালেন এই সংগ্রহশালা দেখতে।

আদি জেরুজালেম যেমন নিষ্ঠুরতার পথে এক করুণাবতারের যাত্রাপথ, এই য়াদ ভাশেম তেমন আজও পৃথিবী জুড়ে সমস্ত ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষদের আধুনিক তীর্থক্ষেত্র।

পুরীর মন্দিরে শুনেছি পান্ডাদের কাছে জাবদা খাতা থাকে। তীর্থযাত্রীরা সেখান থেকে বাপ, পিতামহ বা আদি পূর্বপুরুষদের নাম খুঁজে বার করে, জানতে পারে তার বংশপুরুষও কবে, কখন বা আদৌ এসেছিলেন কি না এই শ্রীক্ষেত্রে।

তেমন হয়তো এই মিউজিয়মে এসেও নেহাৎ সাধারণ কোনও দর্শনার্থীও খুঁজে পেয়ে যান তাঁর কোনও নিখোঁজ পূর্বপুরুষের সন্ধান। অজানা ছবি নাম পায়, পরিচয় লাভ করে। তারপর ধীরে ধীরে নামে, পরিচয়ে, স্মৃতিতে এবং বংশধরদের নীরব অশ্রুতর্পণের সামনে ইতিহাসে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পান কত নামহারা আত্মা।

ঢুকেই প্রথমে একটা ঘেরা জায়গায় জড়ো করা আছে অনেকগুলো বই—মাটিতে, অবহেলায় স্তূপীকৃত। তখন ইহুদি লেখকদের বই পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, কার্ল মার্ক্স, আইনস্টাইন, এরিখ মারিয়া রেমার্ক, টমাস মান, হ্যানস ক্রিশ্চিয়ন অ্যান্ডারসন। কেমন লাগে ভাবতে যে, পৃথিবীর উজ্জ্বলতম আখরগুলো মলিন হচ্ছে চিতাভস্মে, আর সকলে সভয়ে স্মরণ করছেন ১৮২১ সালে হেনরিখ হাইনে'র সেই অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী—

আজ বই পোড়ানো দিয়ে শুরু, এবার মানুষ পোড়ানোর পালা।

ধীরে ধীরে কক্ষের পর কক্ষ পার হয়ে যাই। এবং যে, কোনও সভ্য পৃথিবীর ভাগ্যবান নাগরিক হিসেবে ক্রমশ মাথা হেঁট হতে থাকে, হতেই থাকে, এই ভেবে যে, কেবলমাত্র ধর্ম আর ধর্মের বৈষম্যের জন্য পুড়িয়ে মারা হয়েছে একটা গোটা জাতিকে আর বাকি পৃথিবী নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে থেকেছে কেবল।

কেমন যেন পরিষ্কার হয়ে যায় সব। মুহূর্তে বুঝতে পারি 'ডেড সি' না গিয়ে হলোকস্ট মিউজিয়ম যাব বললে কেন এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মোটির মুখ।

ইজরায়েলি সামরিক দপ্তর নিয়ম করে নতুন শিক্ষানবিশদের পাঠায় হলোকস্ট মিউজিয়ম ঘুরিয়ে দেখাতে। বোধহয়, মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হতে দিতে চায় না এই অপমানের ইতিহাস।

অল্পবয়সি কয়েকটা ছেলেমেয়ে মিলিটারি পোশাকে লাইন করে এ ঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা বলে চলেছেন পরিদর্শক। একবার মনে হল জিগ্যেস করি, যে, কেবল প্রতিহিংসার আগুন নিয়েই বেঁচে থাকবে এই যুবক যুবতী? তা-ই কি উদ্দেশ্য ইজরায়েল-এর সমরশিক্ষানীতির? তারপর মনে হল এতখানি অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন পার হয়ে এসে তারপরেও যদি জোর গলায় বলতে পারি যে, অহিংসাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, তবেই হয়তো আমার এই প্রশ্ন করা মানায়। সাফল্যক্রোড়ে স্থাপিত একজন শৌখিন ফিল্মমেকারের মুখে বোধহয় এই নীতির প্রশ্নগুলো হয়তো একটু বেমক্কা শোনাবে।

তিন

য়াদ ভাশেম-এ একটা অডিও ভিস্যুয়াল সেন্টার আছে। সারা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে সেখানে বিভিন্ন ইহুদি পরিবারের ৮ মিলিমিটার ক্যামেরায় তোলা পারিবারিক দৃশ্য চিত্র, বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অত্যাচারের ছবি। বেশির ভাগ সময়ই নাৎসি কোনও ক্ষমতা-প্রতিনিধির শুটিং থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গোটা হল অফ নেম্‌স জুড়ে ছড়িয়ে আছে এমন সব ছবির প্রদর্শনী। তার সামনে ভিড় করে দেখছে মানুষ। বেশিরভাগই সাদা কালো ফুটেজ, কিন্তু অত্যাধুনিক

প্রক্রিয়ার restoration-এর ফলে ঝকঝকে পরিষ্কার এবং অতীতের অস্পষ্টতামুক্ত।

খোঁজ নিয়ে জানলাম, এই অডিও ভিস্যুয়াল সেন্টারটির প্রতিষ্ঠাতা স্টিভেন স্পিলবার্গ স্বয়ং। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সারা পৃথিবীর নানা ইহুদি ধনকুবেররা।

প্রতিটি প্রদর্শনী কক্ষেই অনবরত গৃহহারা,'ভূমিহারা ইহুদি মানুষদের ছবি, বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অত্যাচারের ফুটেজ ফিরে ফিরে চালানো হচ্ছে বারবার। ধরা যাক একটা আড়াই মিনিটের ফুটেজ শুরু হচ্ছে, শেষ হচ্ছে—মিনিট খানেক পর আবার শুরু হচ্ছে এবং আবার শেষ হচ্ছে, আবার...

ইসাবেল ও সোলি মার্টন। যমজ ভাইবোন। ১৯৩৫-এ হাঙ্গেরিতে জন্মেছিল এরা। দু'জনকেই মেরে ফেলা হয় কুখ্যাত অস্টউইশ্চ ক্যাম্পে।

প্রদর্শনীতে স্থিরচিত্র, স্মারকচিহ্ন, বিভিন্ন উদ্ধৃতির ব্লো আপ ছাড়াও চারপাশে চলছে চলমান ছবির প্রদর্শনী। অনবরত।

একদল মানুষ এটা-ওটা দেখতে দেখতে তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন, দেড় বা আড়াই মিনিটের ফুটেজের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বদলাচ্ছে তাঁদের মুখাভিব্যক্তি, তারপর ধীরে ধীরে প্রায় মন্ত্রাবিষ্টের মতো আবার এগিয়ে যাচ্ছেন অন্য কোনও দেওয়ালে, অন্য কোনও ফিল্ম-ফুটেজ সেখানে হয়তো মাঝপথে।

সেটা শেষ হয়ে তারপর আবার শুরু হচ্ছে ছবি—ততক্ষণে অন্য দর্শকদের একটা স্রোত সেখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। কেবল চলন্ত ছবি, তাতে বাজনা নেই, সংলাপ নেই, এমনকী সম্পাদনাও নেই অনেক সময়, শুধুমাত্র শখে তোলা কোনও ফিল্ম ফুটেজ—তাই হাঁ করে দেখছেন কতশত মানুষ। সত্যিই সিনেমার, চলচ্ছবির এত ক্ষমতা! আশ্চর্য।

কিছু তথ্যচিত্রও আছে এঁদের সংগ্রহে। সেগুলোর নিয়মিত প্রদর্শনী হয় একটা ছোট থিয়েটারে। উৎসাহী মানুষ সেখানেও গিয়ে ভিড় করেন।

আমি ভারত থেকে এসেছি, ছবি বানাই, শুনে অডিও ভিস্যুয়াল সেন্টার-এর ডিরেক্টর আমায় কফি খেতে ডাকলেন। বেশ অমায়িক ভদ্রমহিলা, নানা গল্প করতে করতে আমায় বললেন,

—আপনি যদি এটা নিয়ে কিছু ভাবেন, আমরা কিন্তু সবসময়ই আপনার পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত।

অর্থাৎ আমি যদি ইহুদি জাতির এই অবিচারের ওপর ছবি করার কথা ভাবি, আমার ফান্ডিং-এর অভাব হবে না।

আমি নিতান্ত সরলভাবে, একটু বোকার মতোই বললাম,

—আমাদের দেশেও তো পার্টিশনটা হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। তাই নিয়ে অনেক ভাল ভাল ছবি আছে, কাজ আছে। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও গুজরাত দাঙ্গা হয়েছে। আপনারা তারও কিছু তথ্য, বা পৃথিবী জুড়ে এই ধরনের বৈষম্যজাত হিংসার চিহ্ন যদি চলচ্চিত্রের আকারে রাখেন, তাহলে তো একটা বিশ্ব প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়। সেটা ভাল না?

—না, না। হলোকস্ট-এর মতো ট্র্যাজেডি পৃথিবী জুড়ে একটা দেখান দেখি!

ততক্ষণে বেশ দুপুর। খাওয়াও হয়নি। কফি যেটা দেওয়া হয়েছে, বেশ বিস্বাদ। বুঝলাম এরা হতভাগ্য, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত হয়ে থাকার মনোপলিটা হস্তচ্যুত করতে চান না। আমার গেল মেজাজটা খারাপ হয়ে।

না বললেই পারতাম, কিন্তু ভদ্রমহিলা যখন আবার জিগ্যেস করলেন যে, আমার কোনও মন্তব্য আছে কি না অডিও ভিস্যুয়াল সেন্টার সম্পর্কে, মনে হল প্রকারান্তরে উনি প্রশংসাবাক্যই খুঁজছেন। আমি শুধু বললাম,

—পুরনো ফুটেজগুলো এত ঝকঝকে করে restore না করলেই বোধহয় ভাল হত। প্রথমত, তাতে একটা সময়ের ঘ্রাণ থাকত। দ্বিতীয়ত, এই কসমেটিসাইজেশন-এর ফলে ফুটেজ-এর ভেতরকার ট্রাজেডিও কিঞ্চিৎ কৃত্রিম লাগছে। যখন এগুলো ঘটেছিল, তখন না হয় এগুলো অভূতপূর্ব, কিন্তু তার পরে তো এ নিয়ে অনেক ছবি আমরা দেখেছি। আপনাদের প্রতিষ্ঠাতার 'শিন্ডলার্স লিস্ট'-ই মনে করুন না। রেস্টোর করে ছবিগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা একটু ক্ষীণ হয়েছে মনে হচ্ছে।

ভদ্রমহিলা কেমন একটা হতভম্ব হয়ে গেলেন। কফির কাপ হাতে মাথা নাড়তে লাগলেন যান্ত্রিক সম্মতিতে।

বেরিয়ে যখন আসছি য়াদ ভাশেম থেকে, তখন আরেক দল সামরিক শিক্ষানবিশরা প্রতিহিংসা শিখতে ঢুকছে মিউজিয়মে। ইউনিফর্ম পরে। কুচকাওয়াজ করে।

আমি মোটিকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—আচ্ছা সত্যি কথা বলো তো, কে তোমাদের সব থেকে বড় খলনায়ক—যিশু, হিটলার না সাদ্দাম হুসেন?

মোটি একটু হতভম্ব হল। তারপর কেমন যেন বোকা বোকা একটা হাসি হেসে বলল,

—Why do you always have to ask such tricky questions?

ঋতুপর্ণ ঘোষ

নবনীতা দেবসেন

স্বপ্নের সওদাগর

কে বলেছে স্বপ্ন সত্য হয় না?

এখন আর অর্থাভাব বলে কোনও সমস্যা নেই আমাদের জীবনে। কী চাই? বাড়ি? কী চাই? গাড়ি? ব্যবসার উন্নতি? সন্তানের শিক্ষা? রোগের চিকিৎসা? ছেলেমেয়ের বিয়ে? কোনও ব্যাপারেই আর অসুবিধে নেই। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। অনবরত টিভি-র বিজ্ঞাপনে অথবা টেলিফোন মারফত আমরা শুনছি সেই নিঃস্বার্থ, পরোপকারী দেবতাদের বরাভয়। টাকা কোনও ব্যাপার নয়। বাড়ি এসে ধার দিয়ে যায় লোকে।

তারপরের ব্যাপারটা আর দেবতাদের হাতে থাকে না। সেটা আমাদের। অর্থাৎ ওই ব্যাঙ্ক লোন শোধ করার

ব্যাপারটা। মাসে মাসে ঠিকঠাক কিস্তি শোধ করতে পারলে তো ভাল-কিস্তিমাৎ। আর যদি না পারলে? ধরো দুটো কিস্তি বাদ পড়ে গেল? যেমন হয়েছিল বরানগরের সত্যনারায়ণ দত্তের। প্রতিবন্ধী ছেলেটির মুদির দোকানে ব্যবসা মন্দা যাচ্ছিল। সে আঠাশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল, দোকানের কপাল ফিরিয়েছিল। মাসে মাসে কিস্তি শোধও করছিল। ব্যাঙ্ক তাকে ওপর পড়া হয়ে আরও ১৭ হাজার টাকা টপ আপ লোন দিল। লোভে পড়ে নিয়েও ফেলল সে। এবার সত্যনারায়ণের মুশকিল হল। সে দুটো কিস্তি ফেল করল। তারপরের গল্প আমরা জানি। ব্যাঙ্কের গুন্ডারা এসে তাকে সর্বসমক্ষে এমন অপমান করল যে প্রতিবন্ধী ছেলেটি আত্মহত্যা করল। অথচ এর আগে সত্যনারায়ণ নিজেই ব্যাঙ্কে গিয়ে কথা বলে এসেছিল, সময় নিয়ে এসেছিল। সত্যনারায়ণ-এর বয়স ৩২। তার তরুণী স্ত্রী এবং ট্রেডার্স ইউনিয়ন এফআইআর করেছে। এটা এই জুন মাসের ৬ তারিখের খবর।

সত্যনারায়ণ একা নয়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সত্যনারায়ণরা ছড়িয়ে আছে। কেননা পরবর্তী ধাপে দেবতারা দানব হয়ে লোন রিকভারি এজেন্ট নাম নিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ৩৮ বছরের শকুন্তলা যোশী ঋণ আদায়কারী মস্তানদের দ্বারা অপমানিত হয়ে আত্মহত্যা করলেন ভারতবর্ষের অন্যত্র। যেমন করেছিলেন হিমাংশু এবং তাঁর স্ত্রী, প্রতিবেশীদের সামনে ব্যাঙ্কের তোলাবাজদের দ্বারা অপমানিত হয়ে।

কারুর কারুর অবশ্য প্রতিবাদ করার মনোবল থাকে। যেমন হায়দরাবাদের সেই বৈজ্ঞানিক সিএলএন মূর্তি। তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন যে মৌখিক গালাগালি ছাড়াও, তাঁর শার্ট ছিঁড়ে, চুল কেটে, গোঁফ কামিয়ে, বুকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মুখে থুতু ফেলেছে ব্যাঙ্কের তোলাবাজেরা। লখনউয়ে প্রসিদ্ধ আইনজীবী সোমেশ্বর প্রসাদের গাড়ি থামিয়েছিল বাইক আরোহী ব্যাঙ্ক গুন্ডারা। বন্দুক উঁচিয়ে শাসিয়েছিল, চড়চাপড়ও মেরেছিল খোলা রাস্তায়। ৭৫ বছরের বিধবা প্রকাশ কৌরকেও খুব অপমান করে তাঁর ট্রাকটিও তুলে নিয়ে গিয়েছিল তোলাবাজেরা, তাঁর অন্নসংস্থানের উপায়। যার জীবনে যেটি সবচেয়ে মূল্যবান সেটি কেড়ে নেওয়াই হল এই তোলাবাজদের কর্মপন্থা। কারুর আত্মসম্মান, কারুর বাড়িঘর, কারুর রুজিরোজগার, আর কারুর কোলের শিশু। উত্তর থেকে এবার দক্ষিণে যাই। অন্ধ্রপ্রদেশে এক মিষ্টির দোকানি গোকরি সুব্বাইয়া ১৪ হাজার টাকার ঋণ নিয়েছিলেন। সময়মতো কিস্তি শোধ করতে না পারায় চার হাজার টাকা জরিমানা চাপানো হয়। সুব্বাইয়া ঋণশোধ করতে রাজি, কিন্তু জরিমানা দিতে তাঁর অক্ষমতা জানান। জবাবে ব্যাঙ্ক উপদেশ দেয়, বাড়ি, দোকান বিক্রি করে ঋণ শোধ করো। সুব্বাইয়া এই উপদেশ মানতে রাজি না হওয়ায়, ব্যাঙ্ক একটি মহিলা তোলাবাজ পাঠিয়ে সুব্বাইয়ার আট বছরের কন্যা স্বপ্নাকে তুলে নিয়ে যায়। পরে সুব্বাইয়া পুলিশ দিয়ে উদ্ধার করতে পেরেছে মেয়েকে।

এক কর্মকার তাঁর ফার্নেসের জন্য ১২,০০০ টাকা ব্যাঙ্ক লোন নিয়েছিলেন। সময় মতো কিস্তি শোধ করতে পারেননি, তাই তাঁর বউ-বাচ্চাকেই তুলে নিয়ে গেল ব্যাঙ্ক। দশ দিন বাদে টাকা শোধ করে বউ-বাচ্চাকে ছাড়িয়ে আনেন তিনি।

আর সেই গ্রামের সবজিওয়ালি? ধার শোধ করতে না পারায় ব্যাঙ্কের গুন্ডারা যাঁর পাঁচ মাসের শিশুটিকে কোল থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল? দু'দিন বাদে, টাকা শোধ করে তিনি শিশুটিকে ফিরে পান।

এমন অবস্থা শহরে, গ্রামে সর্বত্র। যার ফলে এলাহাবাদ হাইকোর্ট বাধ্য হয়ে একটি বিখ্যাত ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টারের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হুকুম দিয়েছিল। এবং সুপ্রিম কোর্ট এই লোন আদায়কারীদের সোজা ইংরেজিতে 'goon' অর্থাৎ গুন্ডা বলে অভিহিত করেছে। ব্যাঙ্ক লোন আইনি উপায় ছাড়া আদায় করা নিষিদ্ধ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঘোষণা করেছিল, বেআইনি উপায়ে ঋণ শোধের টাকা আদায় করা হচ্ছে জানতে পারলে ব্যাঙ্ক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

কিন্তু কী ব্যবস্থা নেবে সরকার? কী লাভ হবে এফআইআর করে, সর্ষের ভিতরেই যদি বাসা বাঁধে ভূত? পুলিশরাই যদি হয়ে ওঠে ব্যাঙ্কের তোলাবাজ গুন্ডা? তাহলে কার কাছে আশ্রয় নেবে সাধারণ মানুষ? কার কাছে ব্যক্তি যাবে প্রাতিষ্ঠানিক অন্যায় অবিচারের প্রতিকার চাইতে?

৮ জুনের কাগজে বেহালার সমর কুমার মুখোপাধ্যায়ের আত্মহত্যার খবরে সাধারণ মানুষের মনে এই উদ্বিগ্ন প্রশ্ন জেগেছে। ২০০৬-এ ভদ্রলোক স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কমিউনিকেশনস অফিসার পদ থেকে অবসর নিয়েছে। অসুস্থতার কারণে তাঁর ব্যাঙ্ক লোনের কিস্তি শোধ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। রাত তিনটের সময় বাড়িতে পুলিশ এসে জোরজুলুম শুরু করে দেয়। অসুস্থ মানুষটিকে জবরদস্তি দোতলা থেকে নামতে বাধ্য করে, এবং পরেরদিন সকালে থানায় হাজির হতে আদেশ দিয়ে যায়। এই আদেশ তারা সন্ধেবেলায় বা পরের দিন সকালবেলায়ও দিতে পারত। তাতে পুলিশি কর্তব্যে কোনও হেরফের হত না। মধ্যরাতে পাড়া প্রতিবেশী, ছেলে বউ-এর সামনে এই অপমানে লজ্জায় সমরবাবু ভোরবেলায় গলায় দড়ি দেন। পুলিশ কর্তারা বলেছেন তাঁদের কাছে ব্যাঙ্কের অভিযোগ ছিল, সেই অনুযায়ী তাঁরা কর্তব্য করতে গিয়েছেন রীতিমতো গ্রেফতারি পরোওয়ানা হাতে করে। তারা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে হাতে গ্রেফতারি পরোওয়ানা নিয়ে তাঁরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে কোনও সময়েই বাড়িতে চড়াও হতে পারেন। এ কাজ আইনসিদ্ধ। এরপরে আর আমরা সাধারণ মানুষেরা কী ভাবতে পারি, কী বলতে পারি?

এটুকু বলতে পারি, ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শক্তির ব্যবধান যেভাবে বেড়ে চলেছে তা গণতন্ত্রের পক্ষে ভয়াবহ।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে চাষিরা ধার শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করছেন প্রতিদিন। তাঁদের নাম আমরা জানি না। কিন্তু চাষিদের আত্মহত্যার ব্যাপারটা আমাদের কানে সয়ে গিয়েছে—প্রাণে অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। এখন মধ্যবিত্তের পালা এসেছে। এখনও কি আমরা নড়ে বসব না?

১৮.০৬.০৮

এ
এবার
মলাট

আমার দার্জ

আমি যেমন খুশি দার্জিলিংয়ে থাকি। যখন ইচ্ছে। একরাশ দার্জিলিং ভেতরে নিয়ে আমি এই শহরে পথ হাঁটি। রোজ।

অঞ্জন দত্ত

দার্জিলিং আমার প্রথম সবকিছু। আমায় নাবালক থেকে সাবালক করে তুলেছিল দার্জিলিং।

আমাদের টিচার ছিলেন মিস ব্ল্যাকলি। আমার প্রথম প্রেমে পড়া। বুঝি সেটা। কেন ভাল লাগে চকিত ফ্রস্টেড লিপস্টিকের চমক আর কলারে লেগে থাকে ইয়ার্ডলে। মিস ব্ল্যাকলি আমাদের নাচতে শেখাতেন বাড়িতে ডেকে। ট্যুইস্ট।

ছোটবেলায় বাবা-মা ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। সেন্ট পল্‌স স্কুলের চৌহদ্দিতে। না হলে কেমন করে বুঝতাম লোরেটো কনভেন্টের আশেপাশে গেলে চুলে ব্রিলক্রিম লাগানো কতটা জরুরি। হয়তো আমার দার্জিলিং আর আপনার দার্জিলিংয়ের মধ্যে একটা ফারাক আছে। তাই পাহাড়ে অশান্তি লাগলে আমি চটজলদি ব্যাগ প্যাক করে নেমে আসার চেষ্টা করব না।

আমার দার্জিলিং শুধুমাত্র টাইগার হিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়। আমার দার্জিলিং তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি অ্যাডভেঞ্চারাস; আমার দার্জিলিং আমার সকাল সন্ধেকে পোষ মানতে বাধ্য করেনি। দার্জিলিংয়ে আমি পেয়েছি এলভিস প্রেসলিকে। আবার দার্জিলিং কখন আমার মন থেকে এলভিসকে বাদ দিয়ে বিট্‌ল্‌স-কে বেছে নিতে বাধ্য করল! দার্জিলিংয়ে আমি পেয়েছি জেমস ডিন-কে। আমার অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছেটাকে। সিনেমা বানানোর সাহসটাকে। দার্জিলিংয়ে আমি প্রথম মিথ্যে কথা বলেছি। শাস্তি পাওয়া সত্ত্বেও প্রথম সত্যি কথা বলার আনন্দটা খুঁজে পেয়েছি। দার্জিলিংয়ে আমি চুরি করেছি। ধরা পড়েছি।...

দার্জিলিংয়ে প্রথম সিগারেট, প্রথম মদ খাওয়া। প্রথমবার মেরিলিন মনরো, বিলি ওয়াইল্ডারের ছবিতে। স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখতে যেতাম, বেত খেতাম, আবার যেতাম।

পাকদণ্ডীর আনাচেকানাচে সিগারেটের চোরাকারবার। দেখতে গিয়েছিলাম 'দ্য জায়ান্ট'। পরেরটা—হবে জেমস ডিন-এর কোনও ছবি। শনিবারে শনিবারে চাই এটার স্বাদবদল, চাই ওয়ান মোর থিং ফর ফ্যান্টাসি। দ্য নেক্সট থিং মাথায় যে গেঁথে গিয়েছে ওগুলো। এটাই আমার ছেলে-বেলা!

ছুটিতে কলকাতা চিনতাম, চিনতে হত। পাহাড়ে, তখন তো সব বন্ধ! ক্লাসরুম, স্কুল, প্রেম! মনে হত,

কলকাতা সারাক্ষণ ফুটবল খেলে। পাহাড় কিন্তু গান গায় অবসর সময়। অচেনা একটা নেপালি ছেলের হাত ধরেই আমার গিটার বাজাতে শেখা। এখানে সব্বাই যে কী করে ঠিক গিটারটা বাজাতে পারে, কে জানে। আপনি কলকাতাতেও যদি ক'জন পাহাড় থেকে নেমে আসা মানুষের আড্ডায় যান, দেখবেন মানুষগুলোর একজন গিটার হয়ে যায় বিকেলে বিকেলে। দার্জিলিংয়ের অমন কত সন্ধ্যায় আমরা স্রেফ চুপচাপ গিটার শুনে গিয়েছি, গানের কথাগুলো যে কী, তা না জানলেও চলবে। সেই মুহূর্তটায় মনে হয় অপলক শুষে নিই. যা পাই প্রাণ দিয়ে। পপ সং। ক্লিফ রিচার্ডস, প্রেসলি, নিল ডায়মন্ড, ১৯৬৩ থেকে শুরু। আজও আমি তা-ই রয়ে গেলাম, কেবল দার্জিলিং আছে বলে। পাহাড়ে বৃষ্টি পড়লেই আমার প্রেম করতে ইচ্ছে করত। এখনও করে। পশ্চিম হিমালয় আমাকে সেভাবে কখনও টানে না। গাড়োয়াল বা অমরনাথ, পশুপতি, জানি, মাথা উঁচু করে দেখতে হয়। খুব রুক্ষ, শক্তিশালী, awesome. কিন্তু পূর্ব হিমালয়, আমার এই নেপালি হিমালয়, এই স্যাঁতসেতে ভেজা এফিমিনেট হিমালয় অনেক বেশি টানে আমায়, অনেক কাছের।

বাবা দার্জিলিং পাঠিয়েছিলেন তাঁর মতো উকিল হতে। নিদেনপক্ষে ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার। আসল ইচ্ছে, ছেলে সাহেব হোক। সেই সাহেবিয়ানার আসল সত্তাটা আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। যে সাহেবিয়ানা নির্দিষ্ট কেরিয়ারকে পরোয়া করে না। যে সাহেবিয়ানা ভীষণভাবে অ্যাডভেঞ্চারাস। অনিশ্চয়তা ভয় পায় না।...সেটা বাবার সাহেবিয়ানা হল না। তবে, আমার ভাবতে ভাল লাগে, আমি সাহেব। আমি ক্লাস সেভেন-এ হ্যারল্ড পিন্টার-এ নাটকে অভিনয় করেছি। নির্দেশক আমার টিচার। শহর-কলকাতার ক'টা ইস্কুল ভাবতে পারে, পিন্টারের নাটক ছাত্রদের দিয়ে অভিনয় করাবে? আমি জানি না। এখন কোনও স্কুলে হয়ও না বোধহয় আর।

বাবা তো দেহরাদুন-এও পাঠাতে পারতেন। ওখানেও হয় সাহেবীকরণ। কিন্তু তাহলে আর দার্জিলিংয়ের ফ্লেভার কোথাও থাকত না আমার মধ্যে। আমি চিনতে পারতাম না হাবিব মালিককে। হাবিব জেনেটিক্যালি কাশ্মীরি। অথচ, কোনওদিন কিন্তু ভাবেনি দার্জিলিংয়ে কাশ্মীরি কার্পেটের, সোয়েটারের দোকান খুলবে। তিব্বতি টুকিটাকির দোকান আছে হাবিবের। আমার বন্ধু দীপ অরোরা—পাঞ্জাবি—অথচ হাবেভাবে, এমনকী, দেখতেও নেপালি, আদ্যন্ত। লেমন গ্রাস রেস্তোরাঁটা ওর মর্জি। আর দার্জিলিংয়ের মানুষ, হলপ করে, মর্জির মালিক। লেমন গ্রাসের মতো থাই খাবার আর কোথাও পাওয়া যায় না। কোথাও না। দার্জিলিং কেমন যেন বিভিন্ন মানুষকে অদ্ভুত রকম করে নিয়েছে, তারা সবাই দার্জিলিংয়ের একনিষ্ঠ। They are all very Darj. ক্যাভেন্টার্স, গ্লেনারিজ—লন্ডনের বড় বড় কনফেকশনারিকেও হার মানায়। এটা কিন্তু আমি লন্ডনে গিয়ে প্যাটি এবং পাই খেয়েই বলছি।

আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু হল পুরণ গংমা। পুরণের মতো গিটার বাজিয়ে, চুপচাপ ঘরে বসে থাকা মুশকিল আছে। পুরণ একটা পাব চালায়। যারা কখনও সখনও হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে ওই পাব-এ, তাদের মধ্যে কেউ যদি গিটার বাজনা-বুঝিয়ে হয়, তবেই সেই সঙ্কেটুকুর মতো পুরণ তার প্রকৃত শ্রোতা পেল। নইলে

ছবি সন্তোষ দত্ত

সে বাজায় নিজের জন্য, পাহাড়ের জন্য, কখনোসখনো আমার জন্য, বা দার্জিলিংয়ের জন্যই। পুরণ স্রেফ পাত্তা দেয় না, বাকি পৃথিবী কী ভাবল, না ভাবল। পাত্তাই দেয় না।

দার্জিলিং একটা লাইফ অ্যাটিটিউড। একটা মেজাজ। অস্টিন প্লান্ট, মিস ব্ল্যাকলি, হাবিব মালিক, জ্যামলিন নর্গে। জ্যামলিন তেনজিং নর্গের ছেলে। জ্যামলিন বাবার পথ দেখতে এভারেস্ট-এ উঠল। কেন বলুন তো? এভারেস্ট পরিষ্কার করতে। এত যে লোকেরা একের পর এক ডঙ্কা বাজিয়ে সগরমাথায় উঠল, তাদের এটা সেটা ছড়িয়ে গেল তো পাহাড়টায়। একে কী বলবেন—অনেক কিছুই বলতে পারেন—ইকো ফ্রেন্ডলি চিন্তাভাবনা অমুক তমুক।...আমার কাছে স্রেফ ভালবাসা। অন্য মেজাজ।

জানেন, আমাদের সেন্ট পল্‌স-এ নতুন প্রিন্সিপ্যাল এলেন—আইরিশ মানুষটি—পদবি গিব্‌স। মিস্টার গিব্‌স এসে বললেন, আজ থেকে তালাচাবি তুলে দেওয়া হল। যদি চুরি হয়, তবে বুঝব, সেটাই হওয়ার। সত্যি বলছি, তালাচাবি মুলতুবির দিনগুলোতে স্কুলে, হস্টেলে চুরি প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।

আর ছিল আমাদের স্যাটারডে আউটিংস। দার্জিলিং মেজাজ দেয়। যে রাস্তাটায় আমি প্রথম প্রেম করেছি, সেই রাস্তাটাতেই আমি প্রথম ল্যাং খেয়েছি, আবার বিবাহিত পুরুষ অঞ্জন দত্ত, স্বামী অঞ্জন দত্ত-ও তার স্ত্রী ছন্দাকে নিয়ে গিয়েছে ওই একই রাস্তায়, আপাদমস্তক দার্জিলিং অনুভব করতে, দার্জিলিংকে মাথায় করে রেখে। লাভার্স রোড। এখন আর নেই তেমন। তবু, ছিটেফোঁটাও যা পাওয়া যায়, তাতে আপনি প্রেমে পড়বেন না, প্রেমে উঠবেন।

আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন? আমি কিন্তু দার্জিলিংই যাব। প্যারিস, বা থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া তো আমাকে তেমন হাতছানি দেয় না, যেমনটা দেয় আমার সমস্ত বেলার দার্জিলিংটা।

দার্জিলিংয়ে গোলমাল লেগেছে বলে আমি চিন্তিত। সব গোলমালের একটা কারণ আছে। সমাধানও খুঁজে পাওয়া যায়। দার্জিলিংয়ের অনেক সমস্যা—জল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সেখানকার ভাষার প্রতি আমাদের উদাসীনতা, আরও অনেক অনেক জমাট বাঁধা সঙ্কট। সেই রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধান করবেন রাজনীতির লোক। আমি রাজনীতি বুঝি না। তার থেকে অনেক হাত দূরে থাকি। পাহাড়ের প্রশাসন বলল নেমে যেতে, আর কলকাতার রাজনৈতিক পার্টি বলল, যাবেন না, বিপদে পড়বেন—তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি যখন খুশি দার্জিলিংয়ে যাব, এবং যখন যাচ্ছি না, তখন দার্জিলিং ভিতরে নিয়ে কলকাতাতে হাঁটাচলা করব। কিছুদিন আগে তসলিমা নাসরিনকে কেন্দ্র করে আমার বেনিয়াপুকুর পাড়াটা দুম করে একটা অশান্ত ইসলামাবাদের মতো হয়ে গিয়েছিল। তাই জন্য কি আমি আমার পাড়া ছেড়ে পালিয়ে বালিগঞ্জে গিয়ে থাকব?

আমি আমার পাড়াতেই আছি। আমার দার্জিলিংয়ে থাকব।

অনুলিখন গীতিষা দাশগুপ্ত

2008

সারেগামা এইচ এম ভি-র

রবীন্দ্র প্রণাম ১৪১৫

saregama

Soul of India

১.লাগুক হাওয়া-রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, সাউন্ড ডিজাইন - শুভেন চট্টোপাধ্যায়

২.জীবনের ধ্রুবতারা–স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত
শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বরূপ রুদ্র, সুদেষ্ণা সান্যাল রুদ্র,সাহেব চট্টোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

৩.তব সুর বাজে - কবীর সুমন, লোপামুদ্রা মিত্র, শ্রীকান্ত আচার্য্য ▌ ৪.বাদল-সাঁঝে - শ্রাবণী সেন

৫.আকাশের নীড় - জয়তী চক্রবর্তী ▌ ৬.আমার মুক্তি - তিথি দেব বর্মন

৭.তোমার সুরে সুরে (বেহালা ও অ্যাকোর্ডিয়ানে রবীন্দ্রসংগীতের সুর) - দূর্বাদল চট্টোপাধ্যায়

৮.আমার এ পথ - সাহেব চট্টোপাধ্যায় ▌ ৯.নতুন ক'রে পাব - মিতা হক

১০.তোমায় গান শোনাবো - সুদেষ্ণা চট্টোপাধ্যায় ▌ ১১.বাঁধনহারা গান - জয়তী আচার্য

১২.বনের হরিণ - লিলি ইসলাম ▌ ১৩.আকুল আলোয় - রাহুল মিত্র

১৪.তোমারে করি নিবেদন - উন্মনা দত্ত ▌ ১৫.পথের প্রদীপ জ্বলে গো - ঈশিতা গাঙ্গুলী

১৬.চেতনা - সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রকবিতা সংকলন), আবহনির্মাণ - পন্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য

অ্যালবাম সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

design|whitepaper

দা
দার্জিলিং

একটা পাহাড় যাকে কেউ বুঝতে চাইল না

দার্জিলিং-য়ে আমরা বরাবর সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা, কুয়াশা আর কু-ঝিকি-ঝিকি টয়ট্রেন খুঁজে গেলাম, আর মানবজমিনটা পতিতই রয়ে গেল।
শুদ্ধব্রত দেব

সেলরুটি। পারে-টোপি। ভানুভক্ত। যে কোনও একটি নিয়ে কিছু বলুন। কিছু অন্তত বলুন!

আপনি কিন্তু কম করেও পাঁচবার দার্জিলিং গিয়েছেন। আপনি কিন্তু ইতালি না গিয়েও পাস্তার স্বাদ জানেন, ব্রিটিশ হ্যাট আর ক্যাপের তফাত জানেন, টেনিসন থেকে টেনিদা—সবকিছুরই আপনি মুগ্ধ পাঠক। অথচ আপনি জানেন না, সেলরুটি গোর্খাদের আইকনিক ফুড, বাঙালির যেমন রসগোল্লা। অথচ আপনি জানেন না, খুকুরি বসানো যে নেপালি টুপিটি আপনি মালের রাস্তার ধারের পশরা থেকে দরদাম করে কিনে এনেছেন সেটিই পারে-টোপি! অথচ আপনি জানেন না যে ভানুভক্ত আচার্য্য নেপালি ভাষার জাতীয় মহাকবিই নন, প্রথম কবি! এই অনীহা, এই অশ্রদ্ধা, এই অবজ্ঞা নিয়েই আমরা বারবার গিয়েছি দার্জিলিং-এর কাছে। এরপরেও যদি আমার বন্ধু মদন গুরুং বলেন, 'আসলে দার্জিলিং তোমাদের ভাল লাগে, দার্জিলিংকে তোমরা ভালবাসো না'—তিনি কি খুব ভুল বলবেন?

পাঠক! ভুল বুঝবেন না। এই লেখার প্রথম তিনটি শব্দের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরাও যেন আঁতে নেবেন না। আপনাদের নয়, রোববার-এর ফুরফুরে সকালে আমি যদি সত্যি কারও আঁতে ঘা দিতে চেয়ে থাকি, তো সেটা আমাদের বাঙালি শভিনিজমের, যার উদগ্র বহিঃপ্রকাশ আরও একবার আমাদের দেখা হয়ে গেল গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে সাম্প্রতিক আন্দোলনের সুবাদে।

আসুন, কিছু উদ্ধৃতি শুনি। সহনশীল বাঙালি, মুক্তমনা বাঙালি, প্রগতিশীল বাঙালি গত একমাস ধরে আমাদের যা শুনিয়েছেন।

—এই নাকচ্যাপ্টাগুলোর খুব রস বেড়েছে। বুদ্ধদেবের উচিত একটু ভাল করে গাদন দেওয়া। নয়তো রস মরবে না।

—শুদ্ধদা, কাল সারারাত নেপালি ক্যালাইসি। তোমরা কিন্তু আমাদের সাপোর্ট করবা।

—আবে শালা, আমাদের সঙ্গে পাঙ্গা নিচ্ছিস? আমরা যদি ট্যুরিস্ট না পাঠাই, তোরা খাবি কী?

—সাতটা দিন, আর সাতটা দিন যদি আপনারা ট্যুরিস্ট মুভমেন্ট আটকে দিতে পারেন, ওই পাহাড়িরাই বিমল গুরুং-এর চামড়া তুলবে। পেটে লাথি পড়লেই ওইসব গোর্খাল্যান্ড মোর্খাল্যান্ড মাথায় উঠবে।

—আমরাই তো লাই দিয়ে দিয়ে ওদের মাথায় তুলেছি। দরোয়ানের জাত, দরোয়ানের মতো থাকবি, শেলাম শাব' বলবি!

আমরা আর ওরা! আমাদের আর ওদের! সমতলের আর পাহাড়ের! দু'টো পৃথিবী! বাঙালির আর নেপালির! বাঙালির জগতে দার্জিলিংয়ের অবাধ প্রবেশ, দার্জিলিংয়ের মানুষের নয়। গড়পড়তা বাঙালির কাছে দার্জিলিং মানে এন জে পি স্টেশনে নেমেই—বাবু, গরম জামাটা পরে নাও, দ্যাখো না, পরছে না, বুকে ঠান্ডা বসে যাবে,—ঠিক আছে, ঠিক আছে, পরতে হবে না, গায়ে ফেলে রাখো, শীত করলে পরে নেবে, কানটা ঢাকো, কানটা ঢাকো বাবু, ঠান্ডা ঢোকে কান দিয়ে আর পা দিয়ে—তারপর শিলিগুড়ির ৩৫ ডিগ্রিতে শাল কম্ফর্টার জড়িয়ে গ্যালগ্যাল করে ঘামতে ঘামতে বাবু-বেবি-বাবা-বিবির দার্জিলিং যাত্রা, যে দার্জিলিং মানে টাইগার হিল, দার্জিলিং মানে ম্যালের কাছের হোটেলে ফুডিং-লজিং, দার্জিলিং মানে সেভেন পয়েন্টস, দার্জিলিং মানে মেঘ সরে গেলে পাহাড়চুড়ো আর মেঘ থাকলে সে মেঘের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া, দার্জিলিং মানে পাথরের মালা আর মকাইবাড়ির চা-কাঠের বাক্সে। আর দক্ষিণ কলকাতার এলিট বাঙালি হলে তার দার্জিলিং হল কেভেন্টারস, গ্লেনারিজ, হাবিব মালিকের কিউরিও শপ, গ্লেনবার্গ টি এস্টেট, কার্সিয়ং-এর কনভেন্ট স্কুল, কালিম্পং-এর মর্গ্যান হাউস আর ক্যাসলটনের অরেঞ্জ পিকো-টিনের বাক্সে। এলিট বাঙালির কাছে দার্জিলিং এক অবদমিত চেতনার মুক্তি। কারণ তার স্কটল্যান্ড নেই। যে ঔপনিবেশিকতার গ্যাঁজলায় রামায়ণ-মহাভারত আমাদের ইলিয়াড-ওডিসি, সেই একই হীনমন্যতায় দার্জিলিং প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড। এখানে হাঁটতে হলে কোট-ছাতা নয়, ম্যাকিনটোশ-প্যারাসোল চাই। ব্রিটিশরা গিয়েছেন, গথিক বিল্ডিংগুলো আর কুয়াশাটা তো রেখে গিয়েছে! আর দার্জিলিং অর্থোডক্স চায়ের ওই আর্টিকুলেট ধোঁয়া? কম ব্রিটিশ? নকল করব তো নেপালিদের করব কেন, অনেক কাছের মানুষ ব্রিটিশরা থাকতে?

সেই কুয়াশা আর চায়ের ধোঁয়ার আড়ালে রয়ে যায় অগণিত ফ্যাকাশে মুখ, যে মুখ আমাদের ঘরের মধ্যে ঢোকে দেয়ালে কালোয় সাদা ট্যাপেস্ট্রি হয়ে ঝুলবে বলে,

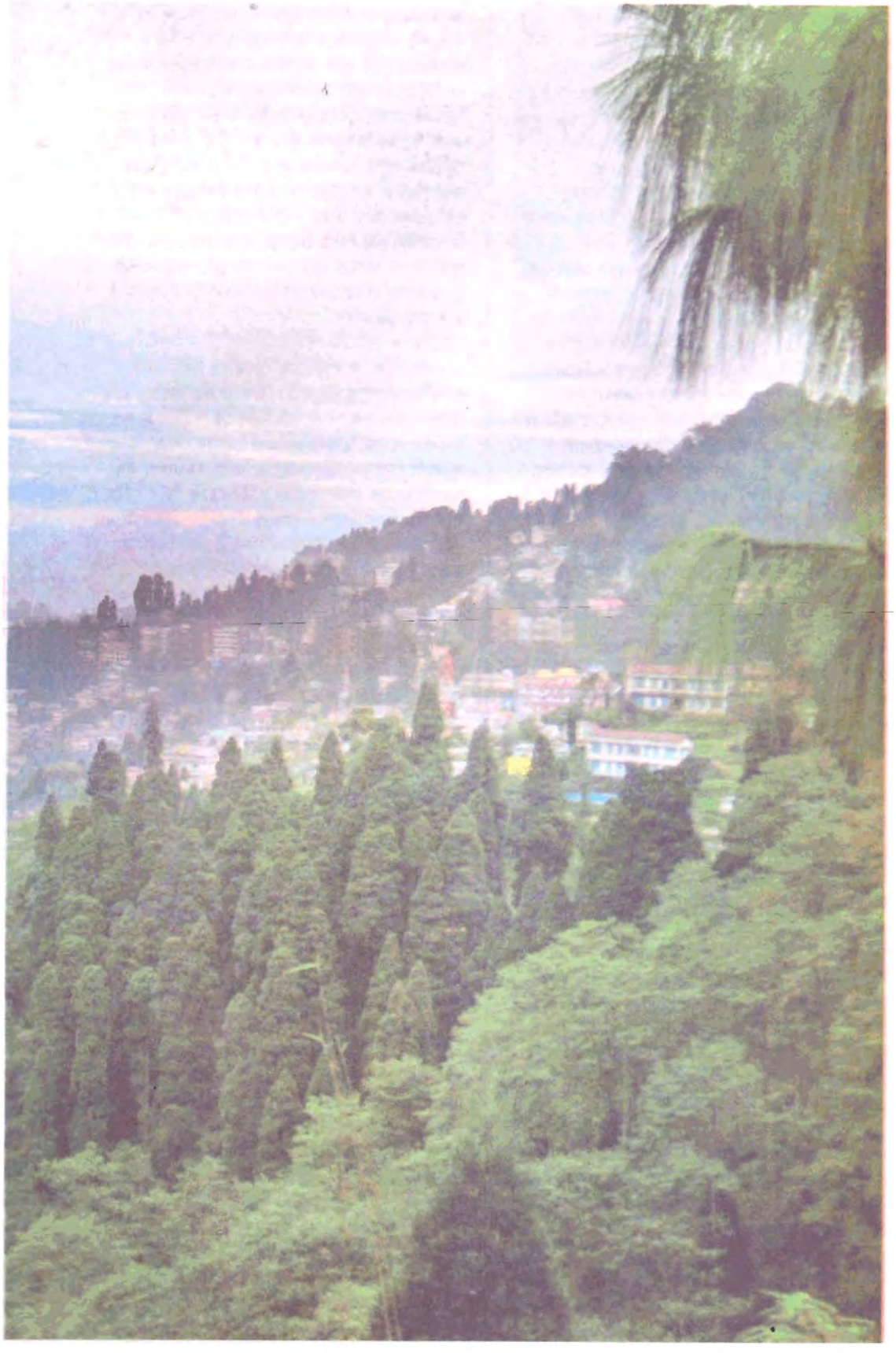

অথবা ঘরের বাইরে গেটে দাঁড়িয়ে থাকে দ্বাররক্ষীর শতাব্দীলালিত আইকন হয়ে। এই আইকনিজমের এমনই চাপ, যে ড্যানি ডেনজংপার মতো পাহাড়ি মানুষের অবিসংবাদী নায়কও (নিজে তিনি গোর্খা নন যদিও) তাঁর জীবনের শেষ ছবি প্রযোজনা করেন নিজেকে বিশ্বস্ত গৃহভৃত্য সাজিয়ে, প্রভু পরিবারের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবার জন্য যে জীবনকে বাজি রাখে। ইন্ডিয়ান আইডলও তাই নক্ষত্র প্রশান্ত তামাংকে দারোয়ানের পোশাকে সাজানোর বেশি কোনও সৃজনী ভাবনা ভাবতে পারে না। এফএম চ্যানেল রসিকতা করে প্রশান্ত চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলে আমাদের গেট পাহারা দেবে কে! অর্জন নয়। আরোহণ নয়। আনুগত্য! গোর্খা দরোয়ান ছাড়া আর যে একটি মাত্র স্বীকৃত আইকন দার্জিলিং-এর পাহাড়িদের রয়েছে, তেনজিং নোরগে, তাঁর স্বীকৃতির কারণও কিন্তু, ধৃষ্টতা মাপ করবেন, প্রয়োজনে নিজের জাতভাই শেরপাদের সঙ্গে ব্রিটিশদের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে গলা না মিলিয়ে সাহেবদের প্রতি আনুগত্যে অবিচল থাকা। এই প্রশ্নহীন আনুগত্যেই একজন পাহাড়ির সব চাওয়া পাওয়ার শেষ। তার আর কিছু থাকতে নেই। তার কোনও ইতিহাস নেই, দর্শন নেই, সাহিত্য নেই, প্রেম নেই, বিরহ নেই, অভিমান নেই, ক্ষোভ নেই—থাকলেও প্রকাশ করতে নেই। ওরা কম বয়সে কানছা, সমবয়সে দাজু, গেটে থাকলে বাহাদুর দেয়ালে থাকলে আভা আর্ট গ্যালারি। ব্যস, আমাদের দার্জিলিং বৃত্ত শেষ। এই বৃত্তের কেন্দ্রে পাহাড়, পরিধিতে পাহাড়িরা। এই পাহাড়িরা সবাই নেপালি! লেপচারাও নেপালি, লিম্বুরাও নেপালি, ভোটিয়ারাও নেপালি, ভুটানিরাও নেপালি! চিনব কী করে, সব তো পাতিকাকের মতো একই প্যাটার্ন—নাক চ্যাপ্টা, চোখ সরু!

চিনতে তো চাইনি। এই ওরা আর আমরায় বিভাজন তো আমাদের, সমতলের বাঙালিদেরই সযত্নে, সচেতনে তৈরি করা। ওদের প্রশান্ত তামাংকে তো আমরা আমাদের রাজ্যের প্রতিনিধি বলে ইন্ডিয়ান আইডল-এ সমর্থন করিনি, বরং ভিন রাজ্যের প্রতিযোগী হলেও গলা ফাটিয়েছি অমিত পালের জন্য, একমাত্র কারণ, সে বাঙালি বলে (মাফ চাইছি, ইন্ডিয়ান আইডল-এর মতো একটি অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ টানতে হল)! আমাদের আমরায় তো কোনওদিন ওরা ছিল না! তাহলে ওরা যদি আজ সেই কথাটাই নিজের মুখে বলে যে, আমরা তোমাদের নই, আমরা আলাদাই ছিলাম, এখন স্বীকৃত আলাদা হতে চাই, আমাদের হঠাৎই কেন এত ঐক্যচেতনা জেগে ওঠে?

প্রশ্ন তো বরং অন্য কিছু নিয়ে উঠতে পারত। গোর্খাল্যান্ড দাবির আরও গভীরে গিয়ে প্রশ্ন তোলা যেত, এই নামকরণের মধ্যেও কী একটা তুলনামূলক বৃহৎ জাত্যাভিমানের বীজ লুকিয়ে নেই? গোর্খারা অবিসংবাদীভাবেই দার্জিলিং পাহাড়ের বৃহত্তম জাতিসত্তা, কিন্তু ভোটিয়াদের মতো তাঁদের বড় অংশটাই একসময় বাইরে থেকে এসেছিল। লেপচা জনজাতি, যাঁরা সিকিম ও দার্জিলিং-এর প্রাচীনতম ভূমিপুত্র, তাঁরাই বা কেন অন্য জাতির নামাঙ্কনে চিহ্নিত হবেন? সেটা কি শুধু এই কারণেই, বাইরে থেকে এসে অন্য জাতি যখনই শাসনভার হাতে তুলে নিয়েছেন (চোগিয়েলের নেতৃত্বে ভোটিয়ারা বা পৃথ্বীনারায়ণের নেতৃত্বে গোর্খারা), তাঁরা বিনা বাধায় দর্শক হয়ে থেকেছেন? নাকি তাঁরা সংখ্যালঘু, এটাই তাঁদের দোষ? কী ক্ষতি হত, যদি লেপচা, লিম্বু, ভোটিয়া, গোর্খা সকলকে নিয়ে একটা সাধারণ অথচ কনফেডারাল সাংস্কৃতিক পরিচিতির কথা ভাবা হতো? প্রশ্ন তোলা যেত, ঘরের পাশের নেপালে ইতিহাসের নিয়মে যার পতন ঘটে গিয়েছে, সেই রাজতন্ত্রের প্রতিভূ পৃথ্বীনারায়ণ শাহকে প্যান নেপালিজমের পথিকৃৎ বলে তুলে ধরাটা ইতিহাসের চাকাকে পিছনমুখে ঘোরানোর ভুল চেষ্টা কি না?

এসব প্রশ্ন তোলার সময় কোথায়? এখন সময় জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলার! (লক্ষ করুন, পাহাড়ে যারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তাঁরা পাহাড়ের ৯৯ শতাংশ হলেও জনসাধারণ নয়, 'গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার লোক', আর সমতলে যারা নেপালি পেটাচ্ছে, তারা সমতলের এক শতাংশ হলেও সেটা 'বন্‌ধের রাজনীতিতে তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠা জনসাধারণের প্রতিরোধ'! প্রশ্ন তুলবেন না, প্রশ্ন তুললেই পাল্টা প্রশ্ন উঠবে—'সরকারি অফিসে কাজ করতে দেবে না, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে মিরিকে উঠতে দেবে না, বাঙালিদের করে খেতে দেবে না—আর আমরা নীচে ওদের গায়ে হাত তুললেই দোষ? আমরা ওদের রেশনের সাপ্লাই আটকালেই দোষ?' আমরা মিলিটারি নামালেই দোষ?—ভুল হয় নিয়াজি-র কণ্ঠস্বর বলে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়কার! তা-ও তো এরা দেশের মধ্যেই আলাদা রাজ্য চেয়েছে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা দেশ হতে চেয়েছিল। বাংলাদেশ কারা কারা যেন তাকে সমর্থন করেছিলেন?

চতুর্দিক থেকে প্রশ্ন ওঠে পর্যটন শিল্পের কী হবে? এই প্রশ্নই প্রমাণ করে দেয়, দার্জিলিংকে আমরা এখনও একটা টুরিস্ট ডেস্টিনেশনের বেশি কিছু ভেবে উঠতে পারলাম না বস্তুত, দার্জিলিং-এ পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই এক মাসে যত বুক চাপড়ানো হয়েছে, তত বোধ করি কলকাতার সবকটা মুহরমের মিছিল মিলিয়েও হয় না! অথচ কলকাতার যে ভ্রমণ ব্যবসায়ীরা আজ দার্জিলিং নিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন, কাল থেকেই তাঁরা বুকিং শুরু করে দেবেন কুমায়ুঁ-গাড়োয়াল-হিমাচল-কাশ্মীরে। ক্ষতি সত্যি যদি কারও হওয়ার থাকে, তা তো ওখানকার পর্যটন শিল্পনির্ভর সাধারণ মানুষের, যাঁরা পর্যটন শাস্ত্রের ভাষায় রিসিভিং এন্ড-এ রয়েছেন। কেউ একবার দু-মিনিট চুপ করে ভাবলেন না, নিজেদের এত বড় ক্ষতি স্বীকার করেও কেন তাঁরা আন্দোলনে যাওয়ার ঝুঁকি নিলেন? উত্তরটা কিন্তু স্পষ্ট, এবং এক বাক্যে সম্পূর্ণ। পাহাড়ের মানুষ মনে করেন যে পর্যটন পাহাড়ের রাজস্বের ড্রেনেজ ঘটিয়েছে মাত্র, উন্নয়নের কোনও দিশা দিতে পারেনি। শুধু পর্যটনই নয়, দার্জিলিং পাহাড়ের অর্থনীতি যে T3 (Tea, Turbine, Tourism) ফ্যাক্টরের উপর দাঁড়িয়ে, তার অন্য দু'টি নিয়েও একই অভিযোগ উঠবে। দার্জিলিং চা শুধু দার্জিলিং-এরই চা নয়, গ্লোবাল স্পেসিফিকেশন

পাওয়ার পর এটা পৃথিবীর সবচেয়ে দামি চায়ের ব্র্যান্ড। বিশ্ব জুড়ে দার্জিলিং চায়ের বাজারের সিংহভাগ চাহিদাই কিন্তু মেটায়, না, আমাদের দার্জিলিং নয়, শ্রীলঙ্কা আর কেনিয়া! দার্জিলিং-এর অধিকাংশ চা বাগানেরই সরাসরি কোনও গ্লোবাল মার্কেট লিঙ্ক নেই, যাদের আছে, তারা এর মধ্যেই মাথা বিক্রি করে বসে আছেন গুডরিক বা টাটার মতো বৃহৎ পুঁজির কাছে। দার্জিলিং-এ পাহাড়ি নদীর খরস্রোতে টারবাইন চালিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হয় দশ মেগাওয়াট, তার আট চলে আসে সমতলে, কোনও ভর্তুকি ছাড়াই, আর দার্জিলিং-এর পাহাড়ের কোণে কোণে গ্রামগুলো থেকে যায় বিদ্যুৎবিহীন। পর্যটন রাজস্বের সিংহভাগও একই নিয়ম চলে আসে সমতলে, কলকাতা-দিল্লি-মুম্বই-আমেদাবাদের ট্যুর অপারেটরদের অথবা বা বাঙালি-মাড়োয়ারি-পাঞ্জাবি হোটেল মালিকদের হাতে, প্রিভিলেজড ভূমিপুত্রদের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি উদাহরণ বাদ দিলে। সরকার-বেসরকার—সক্কলে এইখানে ঝাঁঝিয়ে উঠবেন, কেন এত এত হোটেল হয়েছে আমাদের পয়সায়, এত এত ট্যুরিস্ট পাঠাচ্ছি, এত এত লোক করে খাচ্ছে, এগুলো ডেভেলপমেন্ট নয়? সবিনয়ে বলি, অর্থশাস্ত্র বলে এগুলো ডেভেলপমেন্ট নয়, গ্রোথ মাত্র। আর গ্রোথ যে কখনও কখনও ম্যালিগন্যান্টও হয়ে ওঠে, একথা পর্যটন শিল্পের প্রতিনিধিদের চেয়ে আর ভাল কারা জানবেন?

এসব সত্য চাপা পড়ে যায় দৈনিক কাগজের প্রথম পাতায় চার কলাম জুড়ে ছাপা বনধে অসীম দুর্ভোগ পুইয়ে বাড়ি ফেরা বাঙালি পর্যটক পরিবারের রঙিন ছবির তলায়। মন্ত্রী মুচকি হাসি চেপে বলেন, 'আগেই বলেছিলাম'। আর ট্র্যাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র কাগজে কাগজে, চ্যানেলে চ্যানেলে ক্ষতির খতিয়ান সাজিয়ে বসেন। মুখপাত্রকে সঞ্চালক ব্রেকের সময়ে বলেন—সাতটা দিন, আর সাতটা দিন যদি আপনারা ট্যুরিস্ট মুভমেন্ট আটকে দিতে পারেন, ওই পাহাড়িরাই বিমল গুরুং-এর চামড়া তুলবে। মুখপাত্র নিজেকে প্রশ্ন করেন—কেন? সমতলে 'আমরা বাঙালি'-র ডাকা বনধের দিন যে তরুণ ট্যুর অপারেটররা শিলিগুড়ির হোটেল থেকে আটকে পড়া ট্যুরিস্টদের বিনে পয়সায় গাড়িতে করে স্টেশনে বা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিচ্ছিলেন, তাঁদের পুলিশ কেন হটিয়ে দিল? কেন সেই পর্যটকের কথা তিনি বলবেন না, তড়িঘড়ি নমিয়ে দেওয়ার আগে দার্জিলিং-এর নেপালি হোটেল মালিক যাঁর হাতে একগাদা মিনারেল ওয়াটারের বোতল তুলে দিয়েছিলেন, পথে আটকে পড়লে কাজে আসবে বলে? অথবা সেই সহকর্মিণীটির কথা, সিকিম সীমান্ত থেকে যাঁর গাড়িকে বাইক দিয়ে এসকর্ট করে শিলিগুড়ি সীমান্ত অবধি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন গোর্খা তরুণরা (আর এগোননি তাঁরা, শিলিগুড়ির ধারে কাছে ঘেঁষলে সি পি এম মারবে বলে)? কেন বলা যাবে না, কবরে চলে যাওয়া 'আমরা বাঙালি', অথবা ভুঁইফোড় জনচেতনা মঞ্চের আড়ালে কারা নেপালিদের উপর বাঙালিদের লেলিয়ে দিয়ে একটা জাতিসত্তার আন্দোলনকে জাতিদাঙ্গার দিকে ঠেলে দিল? সকালে পাওয়া ফোন মস্তিষ্কে করাত চালায় 'কাল সারারাত নেপালি ক্যালাইসি, তোমরা কিন্তু সাপোর্ট

ছবি সন্তোষ দত্ত

করবা'। অগোচরে সরোজ দত্তের অমোঘ স্বর কোথাও যেন বাস্তায় হয়ে বৃহন্নলাদের ছদ্মবেশ ছিন্ন করতে বলে। সেই উচ্চারণকে চাপা দিয়ে বেজে ওঠে তীব্র ভয়েস ওভার। পাহাড়ে দুঃস্বপ্নের রাত কাটিয়ে এভাবেই প্রাণ হাতে করে শিলিগুড়ি নেমে এসেছেন হাজার হাজার পর্যটক। আমরা কথা বলছিলাম পর্যটন শিল্পের যে অপরিসীম ক্ষতি হয়ে গেল তা নিয়ে, আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন...। মুখপাত্রের মনে পড়ে কালকের মিটিং-এর সিদ্ধান্ত : 'আমরা কিন্তু কোনও কন্ট্রোভার্সিতে যাব না', আর কে না জানে সত্যি বললেই কন্ট্রোভার্সি! সরোজ দত্ত আবছা হয়ে যান, মুখপাত্র আবার দিতে থাকেন পর্যটনে ক্ষতির হিসেবনিকেশ, লাইভ ফোনে দুষতে থাকেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিনিধিকে, প্রতিনিধি যখন পাল্টা বলেন, পর্যটনের এত ভাল চান তো আমাদের দাবিকে সমর্থন করছেন না কেন, তখন মুখ লুকোন, আমার আর কিছু বলার নেই বলে।

এইভাবেই যে কথা বলার ছিল, তা অনুচ্চারিত থেকে যায়। কথা না বলা হলেই বলার মতো কথা থাকে না, তা তো নয়। ম্যলের রাস্তায় ঘোড়ায় ট্যুরিস্ট চড়িয়ে লাগাম হাতে নিয়ে নিঃশব্দে পরিক্রমা করেছেন যে বুড়ো মানুষটি, নিঃশব্দ বলেই তাঁর যে বলার কিছু নেই তা তো নয়। এই যে এত কথা শুনতে পাচ্ছেন পাহাড়ে, এ সব তাঁরই কথা (নীরব মানুষ কথা বললে কানে বড় বাজে), তিনিই মহাকাল, চিরসত্যি, সুবাস ঘিসিং-বিমল গুরুং-রোশন গিরি-প্রশান্ত তামাং সবাই আজ সত্যি, কাল মিথ্যে। কিন্তু আপনার দার্জিলিংয়ের চেনা কুয়াশা আর টয়ট্রেনের নীলচে ধোঁয়ার আড়ালটাকে সরিয়ে একটু ঠাহর করে দেখুন, মনে পড়বে বাবার হাত ধরে যেবার প্রথম দার্জিলিং-এ এসেছিলেন সেদিনও ওই বুড়ো সহিসটি ছিলেন আপনার ঘোড়ার লাগাম ধরে, আপনি বলেছিলেন—'জোরে ছোটাও, জোরে ছোটাও না...'—ছপটি মেরে তিনি ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে দিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে ক্ষয়াখর্বুটে শরীরটা নিয়ে ছুটছিলেন, আজ তিনি আপনার মেয়েকে ঘোরাচ্ছেন লাগাম হাতে করে, ক্ষয়া শরীরটা আবার ছোটার জন্য দম নিয়ে নিচ্ছে। চিনতে পেরেছেন?

দা

দার্জিলিং

অলংকরণ সৌরেন মিত্র

শীতে উপেক্ষিতা

প্রায় ষাট বছর আগে লেখা ট্রাভেলগ। শীতের একা দার্জিলিং। ভিড় ছিল না কোথাও। ম্যলের দোকানপাট, ব্যস্ততা—না। যা ছিল, সেটুকু কুয়াশা, নির্জনতার রং।

রঞ্জন

একমাত্র মাদ্রাজিরা ছাড়া আমরা ভারতীয়রা সাধারণত আমাদের নামের মধ্যে আদি নিবাসের বিশদ বিবরণ বহন করে বেড়াইনে। কিন্তু তবু, অস্পষ্ট একটা আঞ্চলিক পরিচয় অদৃশ্যভাবে কোথায় যেন লেখা থাকে।

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐক্য নিয়ে আজ থিসিস রচনা করা নিরর্থক। ইংরেজের সহায়তার কায়েদ-ই-আজম সে প্রশ্নের যে নৃশংস মীমাংসা করেছেন তা আমরা সানন্দে না হলেও সম্পূর্ণভাবে শিরোধার্য করে নিয়েছি। আজ আমাকে তাই দার্জিলিং আসতে হলে বিদেশি রাষ্ট্র পাকিস্তান পার হয়ে আসতে হয়। কিন্তু কই, সারা পথে এমন তো একজনকেও দেখতে পেলেম না যাকে দেখেই মনে হয় যে ইনি নিঃসন্দেহে অভারতীয় এবং বিশুদ্ধ পাকিস্তানি!

রাজনীতিক ঘোষণা দ্বারা নতুন নিশান করা যায়, করা যায় নতুন নিশানা। মানচিত্রের চেহারা বদলানো যায় কালির দাগ মুছে দিয়ে রক্তের দাগ কেটে। কিন্তু আকৃতিগত পরিচয়ের পরিপূর্ণ পরিবর্তনসাধন ঠিক এতটা সহজসাধ্য নয়। আদৌ সম্ভব কি না তাও সন্দেহসাপেক্ষ।

চোদ্দোই আগস্ট যে দুই ব্যক্তি রহিমতুল্লা ও কৃষ্ণ মেনন বলে পরিচিত ছিলেন, হঠাৎ পনেরোই আগস্ট প্রভাতে তাঁরা যখন তাঁদের প্রতিবেশীকে গিয়ে বললেন যে তাঁরা দুটি ভিন্ন জাতির লোক, সুপ্তোত্থিত প্রতিবেশী তখন নিশ্চয়ই এটাকে বৃহৎ একটা পরিহাস মনে করে তাঁর ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন, তারিখটা সত্যি পনেরোই আগস্ট না পয়লা এপ্রিল!

শুধু দেশের নয়, প্রদেশেরও একটা পরিচয় প্রত্যক্ষ থাকে আমাদের প্রত্যেকের আকৃতিতে। দীনেশ সরখেলকে দীনশ' সাকলাৎওয়ালা বলে ভুল করবার আশঙ্কা নিতান্তই অল্প, মুখ না খুললেও। আনন শ্মশ্রুমুক্ত হলেও যোধরাজ সিংহকে ভ্রম হয় না সুন্দরম রঙ্গস্বামী বলে। এ প্রসঙ্গে সভয়ে ও সসম্ভ্রমে একথারও উল্লেখ করব যে, সম্প্রতি যে বঙ্গললনাগণ অঙ্গে সালোয়ার-পায়জামা ধারণ করে প্রাদেশিক পরিচয়ের অবলোপ-সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন, আমি অন্তত কখনোই তাঁদের কাউকে রাজপুত রমণী ভেবে বিভ্রান্ত হইনি।

যেমন মানুষের বেলায়, তেমনই জায়গার। তারও

ভৌগোলিক পরিচয় একমাত্র রেলওয়ে স্টেশনের সাইনবোর্ডেই লিপিবদ্ধ থাকে না; ছড়ানো থাকে তার মাটিতে, জলে আর হাওয়ায়। বোলপুর স্টেশনে অবতরণ করলে কাউকে বলে দিতে হয় না যে জায়গাটা সাঁওতাল পরগনার, চব্বিশ পরগনার নয়। হরিনাভির রাস্তায় দাঁড়িয়ে অন্ধজনও জানে যে সে হরিদ্বারে নেই। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'—একথা প্রায় প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধেই বলা যায়, কেন না, প্রত্যেক দেশেরই আছে নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য। বাংলার শ্যামলতা যেমন একান্তই বাংলার।

এই সাধারণ নিয়মের বৃহৎ ব্যতিক্রম হচ্ছে দার্জিলিং। বাংলা কেন, সারা ভারতবর্ষেই দ্বিতীয় দার্জিলিং নেই। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই মনোরম শৈলাবাসে এসে তাই একবারও মনে এই সন্দেহ জাগে না যে, স্থানটি পশ্চিমবঙ্গ নামক প্রদেশের অংশ। জায়গাটার আর যাই থাক, বাঙালিত্ব নেই কোথাও। দার্জিলিং একমাত্র আমলাতান্ত্রিক বিচারেই বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত, আসলে সে শ্যাংরিলার শাখা।

বস্তুত বর্তমান দার্জিলিঙের উদ্ভবই সম্ভব হয়েছে তার অবাঙালিত্বের কল্যাণে। এ যেন অতি ফরসা এক বাঙালি মেয়ে, বিদেশি যাকে বিদেশিনি ভেবে ভুল করে প্রেমে পড়েছে। তারপর ভুল ভাঙলেও মোহ ভাঙেনি, চেষ্টা করেছে পিগম্যালিয়নের মতো আপন স্বপ্নকে রূপ দিতে, প্রাণ দিতে।

আশা করি একথা স্বীকার করলে দেশদ্রোহিতা হবে না যে, আজকের দার্জিলিং বিলাসী ইংরেজদের কল্পনা দিয়ে রচা। তারা এই স্থানটিকে গড়তে চেয়েছিল স্বদেশের প্রতিবিম্ব করে। দূরদেশে নির্বাসিত স্বামী যেমন প্রোষিতভর্তৃকা পত্নীর প্রতিকৃতি কাছে রেখে বিরহকাতর হৃদয়কে শান্ত করে।

প্রাগ্‌ব্রিটিশ দার্জিলিঙের ইতিহাসের অধিকাংশই অতীতের অজ্ঞেয়তায় লুপ্ত। বাকিটা হয় ঐতিহাসিকদের পাণ্ডিত্যে আবৃত, নয়তো ইংরেজের লেখা অপ-ইতিহাসে বিকৃত। বহুদূরবিস্তৃত সিকিম রাজ্যের এই অনুর্বর অংশটি ছিল একেবারেই অবহেলিত। স্বল্পসংখ্যক লোক বাস করত গভীর অরণ্যের অনিচ্ছাদত্ত অনুমতি নিয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জঙ্গু-সম্প্রদায়ের অবাধ আধিপত্য বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে—আজকের হিন্দু যেমন পূর্ববঙ্গে। তারা ছিল, তারা নেই—ইতিহাস তাদের মনে রাখেনি।

দুরন্ততম সন্তানের জন্য যেমন মায়ের স্নেহ থাকে সবচেয়ে বেশি, ইতিহাসের তেমনই পক্ষপাতিত্ব আছে রক্তলোলুপ হিংস্রদের জন্য। তার পাতায় তাই রামদাসের জন্য যদি থাকে চার লাইন, শিবাজির জন্য আছে চার পাতা। ইতিহাসের বিচারে কালিদাসের জন্য এক লাইনই যথেষ্ট, বিক্রমাদিত্যের জন্য চাই পুরো একটা অধ্যায়। ইতিহাসের পাতায় নামাঙ্কন করতে হয় শোণিতাক্ষরে, তার বক্ষবিবরে তাই অবাধে বিচরণ করে নেপোলিয়ন আর বিসমার্ক আর ক্লাইভের দল। স্থানাভাব ঘটে শেলি, শিলার আর কবীরের বেলায়। বিদ্বান আর যেখানেই পূজ্যতে হোক, ইতিহাসে নয়। রাজা ও রাজনীতিকদের সেখানে অপ্রতিহত একাধিপত্য!

যেমন চরিত্রের বেলায়, তেমনই ঘটনার। সেখানেও ইতিহাস সুকৃতির মান মেনে চলে না। নীতিপালনের উল্লেখ থাকে সংক্ষিপ্ততম, অন্তহীন বিস্তৃতি আছে লঙ্ঘনের জন্যে। পাতার পর পাতা জুড়ে আছে রাজ্যজয়ের ইতিহাস, লেখা নেই কোনো রোগবিজয়ের সবিস্তার কাহিনি। দেশে দেশে বা জাতিতে জাতিতে যখন মৈত্রী ও সম্প্রীতি থাকে তখন ইতিহাস তাকে উপেক্ষা করে। ব্যাখ্যান শুরু হয় বিরোধ বাধলে।

ইতিহাসে তাই দার্জিলিঙের আবির্ভাব বিরোধকেই কেন্দ্র করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভুটানিরা সিকিম রাজ্যের যে অংশটা দখল করে নিল আজ তা কালিম্পং নামে পরিচিত। তারপরে এল গোর্খারা। নেপাল অধিকার করে আক্রমণ করল সিকিম, ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে চলল ছোটো-বড়ো নানা আকারের খণ্ডযুদ্ধ। সিকিমের সাধ্য ছিল না গোর্খাদের উন্নততর যুদ্ধ পদ্ধতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার। তিস্তা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তারা পদানত করল সমগ্র তেরাইভূমি। নেপাল রাজ্যের পরিধিই শুধু প্রসারিত হল না, প্রতিপত্তিও।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বয়স তখন বছর পনেরো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা ভারতের বৃহৎ অংশেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবার প্রয়োজন বিস্তৃতির। ইয়োরোপের প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রায় সবাই একে একে রণক্ষেত্র থেকে বিদায়গ্রহণ করেছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব সকল প্রতিরোধকে অক্ষম করেছে অনেক দিনের জন্য। সম্মুখে অগ্রগতির পথ অন্তহীন এবং প্রায় বাধাহীন।

কিন্তু উত্তর-পূর্ব দিগন্তে দেখা দিল অপ্রত্যাশিত কালো মেঘের আভাস। নেপালের শক্তিবৃদ্ধি কোম্পানির হস্তক্ষেপের সমর্থনে অজুহাত উদ্ভাবনে অযথা কালক্ষয় হয়নি। আহা, সিকিমের এমন বিপদের সময় ইংরেজ কি পারে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে? বিধিনির্ধারিত কর্তব্য কি নেই ইংরেজের? সিকিমের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় নেপাল? ইংরেজ থাকতে এমন ঘটনা হতেই পারে না। পরের স্বাধীনতাহরণ যে ইংরেজের জন্মগত অধিকার। সে অধিকারে আর কারো হস্তক্ষেপ অক্ষমণীয়।

তাই যুদ্ধ ঘোষিত হল স্বাধীনতার শত্রু নেপালিদের বিরুদ্ধে। সে সকল যুদ্ধের সঙ্গে আজকের যুদ্ধের সাদৃশ্য সামান্য। মানবের উদ্ভাবনী শক্তি তখনও এমন পরিপূর্ণভাবে ধ্বংসের সেবায় আত্মনিয়োগ করেনি। সে যুদ্ধের প্রকৃতি এমন ভীষণা ছিল না, ক্ষেত্র ছিল না বিশ্ববিস্তৃত কিন্তু আজ যেমন প্রত্যেকটা যুদ্ধের জন্য নতুন নতুন নাম আবিষ্কার করতে না পেরে বলি বিশ্বযুদ্ধ এক বা বিশ্বযুদ্ধ দুই, তেমনই নেপাল যুদ্ধগুলিরও নম্বর দেওয়া আছে ইতিহাসের বইয়ে। এক দুই তিন। সেই যুদ্ধের অন্তত একজন বীরের স্মৃতির উদ্দেশে কলকাতায় আজও আছে আকাশছোঁয়া এক স্তম্ভ—অক্টরলোনি মনুমেন্ট।

ইংরেজ অপরের স্বাধীনতা সত্যি রক্ষা করে, কিন্তু বিনামূল্যে নয়। মূল্যটা সাধারণত বড়োই উচ্চমূল্য, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে মূল্য দিতে হয় রক্ষিত স্বাধীনতাকেই সমর্পণ করে। সিকিমের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হল না। তিতালিয়া-য় স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রে নেপালিরা সিকিম থেকে নেওয়া সমগ্র তেরাইভূমি ফিরিয়ে দিল, কিন্তু সবটা সিকিমের হাতে পৌঁছল না। সলিসিটরের আদায়ীকৃত অর্থের কতটুকু বাকি থাকে তার

পাওনা মিটিয়ে দেবার পরে?

মেচি থেকে তিস্তা পর্যন্ত জায়গাটা কোম্পানি সিকিমকে ফিরিয়ে দিল বটে, কিন্তু বিনা শর্তে নয়। নেপাল আর ভুটানের মধ্যে অবস্থান করে সিকিম হল ইংরেজিতে যাকে বলে বাফার স্টেট। কোম্পানি রইল সে রাষ্ট্রের স্বাধীনতার রক্ষক, কোম্পানি গ্যারান্টি করল সিকিমের সভরেনটি। ইংরেজের অধীন থাকা যে পূর্ণ স্বাধীনতারই নামান্তর কোম্পানির সাহেবের মনে সে সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। সেই পূর্ণ স্বাধীনতায় একটু যা কিন্তু ছিল তা শুধু এই যে প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে সিকিমের যদি বিরোধ বাধে তাহলে কোম্পানিকে ডাকতে হবে মধ্যস্থতার জন্যে। আর কিছু নয়, শুধু পরোপকার!

বিরোধের জন্যে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি ইংরেজকে। নেপাল-সিকিম সীমান্তে এমনই এক বিরোধ মেটাবার জন্যে মহামান্য গভর্নর জেনারেল প্রেরণ করলেন দু'টি বিশ্বস্ত অফিসার—ক্যাপ্টেন লয়েড এবং মিস্টার গ্রান্ট। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লয়েড ছ-দিন কাটিয়েছিলেন 'in the Old Goorkha Station of Darjeeling'। তিনি এলেন, তিনি দেখলেন, দার্জিলিং তাঁর চিত্ত জয় করল। একশো উনিশ বছর পরে যেমন করেছে আমার।

মিস্টার গ্রান্ট তদনুযায়ী রিপোর্ট করলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিংকের সমীপে। বললেন, রণক্লান্ত সৈনিক ও শাসনশ্রান্ত কর্মীদের স্যানিটরিয়মের জন্য এমন উপযোগী স্থান আর নেই। কেবলমাত্র অবসর বিনোদনের জন্যই নয়, সামরিক কারণেও দার্জিলিঙের প্রয়োজন ছিল। নেপালের উপর প্রহরিতার জন্যে। ক্যাপ্টেন হার্বার্ট ও মিস্টার গ্রান্টের পরিদর্শনের পরে দার্জিলিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। কোম্পানির ডিরেক্টররা সে সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন। আর যা বাকি রইল তাকে বলে ফর্ম্যালিটি।

১৮৩৫-এর পয়লা ফেব্রুয়ারি সিকিমের রাজা যে দানপত্রে স্বাক্ষর করলেন তাতে লেখা রইল

The Governor General, having expressed his desire for possession of the hill of Darjeeling on account of its cool climate, for the purpose of enabling the servants of his Government, suffering from sickness, to avail themselves of its advantages, I, the Sikimputtee Rajah, out of friendship for the said Governor General, hereby present Darjeeling to the East India Company, that is, all the land South of the Great Rangit river, East of the Balasun, Kahail and Little Rangit rivers and West of Rungnu and Mahanadi river.

সিকিমের রাজার সঙ্গে জেনারেল লয়েডের কী আলোচনা হয়েছিল জানিনে। সে আলোচনার ফলে কী অবস্থায় রাজাকে ইংরেজের হাতে দার্জিলিং সমর্পণ করতে হয় তারও বিশদ কোনো বিবরণের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই। অন্তত কাগজপত্রে লেখা রইল যে, ইংরেজ দার্জিলিং হরণ করেনি, উপহার পেয়েছে।

উপহারপ্রাপ্তির চার বছর পরে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডক্টর ক্যাম্পবেলকে দার্জিলিঙের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিয়োগ করা হল এবং তখন থেকেই শুরু হল দার্জিলিঙের উন্নতি। দশ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা একশো থেকে দশ হাজার হল। ১৮৫২ সালে একজন সরকারি পরিদর্শক লিখলেন, 'দার্জিলিঙের যা কিছু উন্নতি হয়েছে তার সবটুকুর জন্য সকল কৃতিত্ব ডক্টর ক্যাম্পবেলের প্রাপ্য। দুরধিগম্য অরণ্যভূমিকে তিনি পরিণত করেছেন অপরূপ শৈলাবাসে; আবাসের অযোগ্য পার্বত্য উপত্যকা থেকে সৃষ্টি করেছেন অনুপম ভূস্বর্গ।'

নির্মল, উজ্জ্বল, প্রাণদায়ী রৌদ্রে উদ্ভাসিত ম্যালে উপবেশন করে, ডক্টর ক্যাম্পবেল ও তাঁর স্বজাতির সকল দুষ্কৃতি ক্ষমা করলেম সানন্দ চিত্তে।

অর্থনীতির ভাষায় যাকে স্ক্যায়ার্সিটি ভ্যালু বলে—দুষ্প্রাপ্যতার মূল্য—দার্জিলিঙে রৌদ্রের তা আছে। বিশেষ করে জানুয়ারির শেষে। সেই দুর্লভ রৌদ্র যখন আবির্ভূত হয় তখন ঘরে থাকে না কেউ। উন্মত্ত সবাই ছুটে আসে আকাশের উন্মুক্ততায়; প্রাণভরে, দেহভরে রোদ পোহাতে। ম্যালে তাই আজ বেশ ভিড়, অর্থাৎ অন্তত জন কুড়ি লোক বিভিন্ন বেঞ্চিতে বসে প্রার্থনা করছে যেন রোদটা একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়। পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, কিন্তু সাদা চোখে দূরত্বটা এত বেশি মনে হয় না। এমন অপরূপ প্রভাতে সব কিছুকে কাছে মনে হয়—কাঞ্চনজঙ্ঘাকে, ওই বেঞ্চির ওই ভুটানিগুলিকে, পরের বেঞ্চির ওই ইংরেজকে, তার পাশের ওই অবাঙালি কিশোরকে।

রৌদ্রের স্বচ্ছতায় অপরিচয়ের ব্যবধান সাময়িকভাবে অপসারিত হয়। একজন আরেকজনকে ডেকে বলে, 'Glorious sunshine, isn't it?' অপরজন প্রশ্নের ছদ্মবেশে সানন্দ সমর্থন জানায়, 'Isn't it?'

ইংরেজ ভদ্রলোক আলাপটাকে আরও একটু প্রসারিত করে বললেন, 'এমন সুন্দর রৌদ্র যে হাতের কাজ ফেলে বেরিয়ে পড়েছি। জলে আর মাটিতে হাতদুটো প্রায় জমে গিয়েছিল!'

'জল আর মাটি কেন?'

'ওই আমার রুটি আর মাখন। আমি ভাস্কর।'

আর কৌতূহল দমন করতে পারলেন না, বললেম, 'কার মূর্তি গড়ছেন এখানে?'

ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে হাসলেন, 'দাঁড়ান, তাঁর নামটা লেখা আছে আমার ডায়েরিতে। ঠিকভাবে কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারিনে।'

ডায়েরিতে নামটা পড়লেম, ভানু ভক্ত।

ক্রমে জানলেম যে, ভানু ভক্ত নেপালিদের সবচেয়ে বড়ো কবি। তাঁর ভক্তিরসাত্মক কাব্য নেপালিদের শুধু আনন্দই দেয় না, প্রেরণাও। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত হচ্ছে আবক্ষ মর্মরমূর্তি যা স্থাপিত হবে ম্যালে। ভাস্কর, তাঁর নাম টমসন, বললেন, 'আমার ইচ্ছে ছিল পূর্ণাবয়ব মূর্তি গড়বার। কিন্তু অত খরচা করবার সামর্থ্য নেই এখানকার কর্তাদের। তাই অল্পেই তুষ্ট থাকতে হবে।'

লেখক পরিচিতি আসল নাম নিরঞ্জন মজুমদার। ইংরেজি পত্রিকা ক্যাপিটাল-এর প্রথম ভারতীয় সম্পাদক। ডাকসাইটে, দুর্দান্ত এই সাংবাদিক প্রথম স্বাধীনতা দিবসের ধারাবিবরণীর জন্যও বহুল প্রসিদ্ধ।

গো
গোসাঁই
বাগান

জয় গোস্বামী

কবিকে বলা হয় দূরদ্রষ্টা। অনেক দূর দেখতে পান কবি। কতদূর? রক্তকরবী অনেক দূর দেখতে পেয়েছে বলে আমরা জানি। জীবনানন্দের কবিতা দেখতে পেয়েছে বহুদূর। কতদিন ধরে কত মানুষের মনকে দেখতে পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান। আর মহাভারত দেখতে পেয়েছে যেন পুরো সভ্যতাকে। এই সবই আমরা জানি। নানা তর্ক সত্ত্বেও মোটামুটি মেনেই নিয়েছি। এই সকল রচনাই এক কালে বসে অনেক দূরের ভবিষ্যৎ সময়কে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু আজ আমার মনে পড়ছে অন্যরকম দূরকে দেখার একটি কবিতার কথা। বলি তবে সেই কবিতা

২০০১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন
মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসেছে।
সন্ধ্যেবেলা বার বার ঘরবার করি, পুব আকাশে
তাকাই
মঙ্গল কি উঠল?
এক সময় সাতটা সাড়ে সাতটায় দেখি, রাস্তার
পাশের
দেবদারুর মগ্‌ডাল ছাড়িয়ে সে উঠে বসে আছে।
মেঘ করেছে।
মাছির চোখের মতো তুচ্ছ আলো জ্বালিয়ে একটা
প্লেন
গোঁ গোঁ করে মেঘের ফাঁকে
দমদমের দিকে উড়ে গেল।
মঙ্গল প্রেমের গানের রাঙা মুকুলের মতো দিনশেষে
ফুটেছে, একলা,
পাতলা মেঘ জলকণা দিয়ে তার রাগ আর নিঃসঙ্গতা
মুছিয়ে দেয়।
আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছি
সেই নিঃসঙ্গ যোদ্ধা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে
পাঁচতলার কার্নিসের ওপারে
চলে গেল।
আর কয়েকদিন তাকে ওইরকম উজ্জ্বল দেখব,
তারপর ক্ষীণ দেখব,
তারপর আর দেখব না।
সে অথবা আমি, যে-কেউ একজন
অনন্ত দূরে চলে গিয়েছি।
মঙ্গল। মনীন্দ্র গুপ্ত। শ্রেষ্ঠ কবিতা।

এই কবিতা হল আকাশে তাকালে যে দূরত্বকে দেখা যায়, সেই দূর দেখার কবিতা। কাগজ পড়ে জানা গিয়েছে যে, আজ ২৫ জুন মঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবে। তারই জন্য একজন মানুষ সন্ধে থেকে ঘর বার করছে, কখন সেই লালগ্রহকে দেখা যাবে? ভোরে ধূমকেতু দেখা যায় শুনে আমরাও তো অনেকে শেষরাতে উঠে ছাদে যেতাম। এ অনেকটা সেইরকম। তারপর একসময় দেখা গেল, সে, মানে মঙ্গল, দেবদারুর মাথা ছাড়িয়ে উঠে বসে আছে। এখানে ছোট্ট ছোট্ট দু'টি জিনিস চোখে পড়ে আমার, একটা হল, ঠিক কখন মঙ্গলকে দেখা গেল, তা নিশ্চিত নয়, সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে কোনও একটা সময়, এমনকী, পরেও হতে পারে—মঙ্গল দেখাটা এত জরুরি যে, সময় কে আর অত নিখুঁত করে মনে রাখে। দ্বিতীয় হল, এই দূর গ্রহ মঙ্গল যেন চেনা কেউ, উঠে বসে আছে, এই বলাটার মধ্যে সেই আত্মীয়তার ভাবটুকু আছে। আরে কখন উঠে বসে আছে, আর আমি কি না হা পিত্যেশ করছি সেই থেকে। এমন একটা ভাব, যা আমরা আপন কেউ চেনা কেউ সম্পর্কে বলি। কেন চেনা হবে না? কত ছোট থেকেই আমরা মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে নানা তথ্য খুঁজে খুঁজে পড়ি। নানা আবিষ্কার জানতে পারি। ওই জন্য সে একদিকে চেনা। আর একদিকে অচেনাও। কারণ অন্যদিকে মঙ্গলগ্রহের কত রহস্য তো বিজ্ঞানীরা জানতে পারেননি এখনও। অবশ্য যে কোনও আকাশবস্তুই আমাদের কাছে রহস্যময় অচেনা। এমনকী, অত যে চেনা বিমান, সে তো যন্ত্র মাত্র, মানুষের তৈরি যন্ত্র, কিন্তু গোঁ গোঁ করে মেঘের ফাঁকে যে উড়ে গেল, তা দেখেও কি ভেতরটা কেমন হয়ে গেল না! আমার তো হয়। হয়তো যশোর রোড দিয়ে যাচ্ছি, একটা প্লেন টেক অফ করল, উঠছে, উঠছে, শূন্যের দিকে উঠে যাচ্ছে—মনে কী যে একটা হতে থাকে। অথচ প্লেনের ভেতর বসে নীচে ক্রমশ ছোট হয়ে যাওয়া বাড়ি ঘর দেখলে তেমনটি হয় না, কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশে আরও আরও শূন্যতায় চলে যাওয়া বিমানকে দেখলে যেমন হয়। এখানে মঙ্গল একলা, মেঘ করেছে। আজকে সে জ্বলজ্বল করছে একটু বেশি, কারণ আজ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি তো ওই গ্রহ। তার রং লাল, আমরা জানি, তাই রাঙা মুকুলের কথা এল। প্রেমের গানের রাঙা মুকুল। কিন্তু দিনশেষে, অর্থাৎ প্রান্ত বয়সে যে প্রেমের মুকুল ফোটে, সে তো একলা, সাংঘাতিক একলা—লাইনের শেষে তাই সাদামাটা ভাবে রেখে দেওয়া আছে 'একলা' শব্দটি। এই 'একলা' শব্দটি এবার আরও একটু চলতে থাকে। পরের লাইনেই আছে পাতলা মেঘ জলকণা দিয়ে তার রাগ আর নিঃসঙ্গতা মুছিয়ে দেয়। 'রাগ' কথাটা এল। আর 'একলা' কথাটির বদলে এলো 'নিঃসঙ্গতা' শব্দটি।

এই দু'টি কথার মধ্যে এ কবিতায় ছোট একটি তফাৎ আমি দেখতে পাই। দিনশেষে যে রাঙা মুকুল, জীবনপ্রান্তে এসে যে প্রেম, সে তো একলা, ঠিকই, সেই প্রেম আসার পরেই হঠাৎ সে সাংঘাতিক একলা হয়ে

পড়ল একদিক দিয়ে। দিনশেষে ফুটেছে, একলা। আবার তার একটা ফুটে ওঠাও আছে। কিন্তু 'নিঃসঙ্গতা' কথাটার মধ্যে তার অনেকদিন ধরে একাকী থাকার একটা আভাস আছে। আর নিঃসঙ্গ থাকতে থাকতে অনেক সময় মানুষ কেমন যেন রাগী হয়ে যায়। মঙ্গলকে দেখতে পাওয়ার পরের কথাটাই ছিল, মেঘ করেছে। মেঘ করার থমথমে আবহটি রাগ কথাটির পূর্বাভাস তৈরি করেছিল। এমন হতে পারে, সেই মুহূর্তে আকাশের বর্ণনা হিসেবেই মেঘ করেছে কথাটি এসেছিল, কিন্তু, আড়াল থেকে তা ওই রাগ ও নিঃসঙ্গতার আবহ গঠন করছিল যেন। এই জায়গাটায় একসঙ্গে অনেকগুলি জিনিস এল। দিন শেষে রাঙা মুকুলের প্রেমচিহ্ন। তার ফুটে ওঠা। যদিও এ কবিতা কখনওই প্রেমের কবিতা নয়। একটি লাইনে মাত্র একটি গানের উল্লেখে প্রেম এসেছে, চলেও গেছে। তবু, 'ফুটেছে' আর 'একলা' কথা দু'টির জন্যই এতটা বললাম এই নিয়ে—কেননা, আমার একটি স্বভাব হল, নিজের জীবনকে একটু মিশিয়ে না-নিলে কোনও কবিতাকেই আমি দেখতে পাই না। প্রেমের প্রসঙ্গটি এখানে কণ স্বরের মতো লেগেছে। বাদক যেমন গান্ধারটিতেই আসলে জোর দেবেন, কিন্তু নখের কোনা দিয়ে একটু ছুঁয়ে এলেন মধ্যমকে, অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য এল পদটিতে। তেমনই স্বরের কণার মতো প্রেমের কণিকামাত্র লাগল এখানে। এরপরই এই লেখা অধিকতর নিঃসঙ্গতার কথা বলে। কারণ, আমরা দেখি ওই লালগ্রহ মঙ্গল এখানে নিঃসঙ্গ যোদ্ধা। সে যুদ্ধ কি তার একাকী থাকার জন্য যুদ্ধ? অথবা লাল রং কি ক্রোধের রং? যেমন একটু আগে, ওই লাল রঙই রাঙা শব্দের রূপে প্রেমের গানের কথা মনে করিয়েছে? এখন কি সেই লাল রং হয়েছে যুদ্ধের রং? তাই সে এখন যোদ্ধা? যদিও একাকিত্ব তার ঘোচেনি, তাই সে নিঃসঙ্গ যোদ্ধা। এদিকে সন্ধে-রাত উত্তীর্ণ হল; সেই রক্তবর্ণ গ্রহ, উপরে উঠতে উঠতে কোনও একটা ফ্ল্যাটবাড়ির কার্নিসের আড়াল হয়ে গেল। কবিতাটিতে কিন্তু আড়াল হয়ে গেল লেখা হয়নি। লেখা আছে 'কার্নিসের ওপারে চলে গেল।' কেন, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বলি, এরপরই এই কবিতাটিতে বিরাট একটি আশ্চর্যকে আমরা দেখতে পাই।

এই যে আজ লালগ্রহ মঙ্গলকে এত স্পষ্ট দেখা গেল, এ তো কেবল এইজন্য যে, আজ ২৫ জুন ২০০১, সে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসেছে। গত কয়েকদিন ধরেই যেমন তাকে উজ্জ্বল দেখা গেছে, এরপরও কয়েকদিন তেমনই দেখা যাবে। যদিও ক্ষীণতর হতে থাকবে তার আভা, একসময় আর দেখা যাবে না। যে মানুষটি সন্ধে থেকে ঘরবার করছিল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসা মঙ্গলের রূপটি দেখবে বলে, সে বুঝতে পারছে, তাকে আর দেখব না। এরপরই দু'টি লাইন আছে :

সে অথবা আমি, যে-কেউ একজন
অনন্ত দূরে চলে গিয়েছি।

এতক্ষণ কবিতাটিতে আমরা দেখছিলাম, মঙ্গল ফুটে উঠল, তারপর ফ্ল্যাটবাড়ির আড়াল হয়ে গেল, ক'দিন উজ্জ্বল থাকবে, তারপর আর তাকে দেখা যাবে না। এইসব কথা জানতে পারছিলাম। দেখাটা চলছে কবিতায় এইভাবে। এইবার শেষ দু'টি লাইনে এসে দেখাটা ঘুরে গেল। মহা আকাশের মধ্য থেকে যদি পৃথিবী গ্রহের মানুষটির দিকে তাকানো যায়?

কবিতাটি পড়তে পড়তে আমরা সবাই মাটি থেকেই লাল আলোর গ্রহটিকে দেখছি। ভাবছি, ওই তো গ্রহ, দেখা দিচ্ছে, কাছে আসছে, সরে যাবে এবার। আমিও যে মহাজগতের মধ্যে একটি বস্তু, আমিও যে প্রতি মুহূর্তে সরে সরে যাচ্ছি দুর্দমনীয় বেগে, তা কি এতক্ষণ মনে রেখেছিলাম। কেবল এই গ্রহটি সরে যাচ্ছে, কে বলল? আমিও তো দ্রুত ধাবমান মহাশূন্যে? এই ঘূর্ণমান পৃথিবীর সঙ্গে? এক মুহূর্তে সব ওলট পালট হয়ে গেল। এই কবিতাটির শেষপ্রান্তে এসে শরীর শিরশির করে। মনে হয়, যেন দুলছে এই মহাপৃথিবী। আমাকে নিয়ে সে অনন্ত দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে। প্রতি সেকেন্ডে...কোথায় যাচ্ছে, তার বিন্দু বিসর্গ আমি জানি না। এতক্ষণ, মাটিতে দাঁড়িয়ে, এই কবির সঙ্গে, নিরাপদে, আকাশের তারা দেখছিলাম। এক নিমেষে আমার স্থিতির বোধ পাল্টে গেল। বিরাট ও অজানা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি ছুটে চলেছি। এই গোল বল আমাকে নিয়ে কোথায় চলেছে? চারিদিকে এত তারা? এক ঝলকে স্ট্যানলি কুব্রিকের তৈরি দ্য স্পেস ওডিসি ছবিটির একটি দৃশ্য মনে ভেসে যায় যেখানে এক নভশ্চর দুর্ঘটনার ফলে সংযোগ ছিন্ন অবস্থায় মহাকাশে হারিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। দূরে সরে যেতে যেতে এক সময় সে মুছে যায় স্পেসের ভেতর। তেমন একটা পরিবেশ তৈরি হয় মনে। প্রায় বিশ্বরূপ দেখার অভিজ্ঞতা জন্ম নেয় যেন।

অথচ পুরো এই কাজটাই, এই কবি, মনীন্দ্র গুপ্ত করেছেন 'সে অথবা আমি' এই কথাটুকু মাত্র ব্যবহার করে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে শুধু 'আমি' শব্দটি এখানে এসে পুরো কবিতাটিকে মহাকাশব্যাপী অনন্তে স্থাপন করল। এ এক আশ্চর্য দেখা। অপ্রত্যাশিত দেখা। অনন্ত দূর থেকে এক হিসেবে নিজের অবস্থান দেখা। ওই দ্রুত সরে যাওয়া গ্রহটি থেকে যেন দেখা যাচ্ছে এক মনুষ্যপ্রাণীকে।

এই কবিতার শেষ দু'লাইন পড়বার পর এক অকল্পনীয় অভিজ্ঞতার অংশ ভাগী হই আমরা, যা পূর্বে কখনও ধারণা করিনি। বা করলেও, জীবনানন্দ থেকে ধার করে বলা যায়, তা এমন কৃতার্থ সংস্থানের মধ্যে ছিল না।

অন্যদিকে, যারা কবিতার পাঠক, তাঁদের কাছেও এটা স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে দেখা দেয়, মাত্র 'আমি' শব্দটির স্থাপনার ফলে এত বড় একটি অভিজ্ঞতার কাছে যাওয়া যায়। এখানে, কবি, ইচ্ছে করেই বিবৃতিমূলক কবিতার ছদ্মবেশে লেখাটিকে হাজির করেছেন প্রথম থেকে। যে কোনও পাঠক, মনীন্দ্র গুপ্তের কবিতাগ্রন্থের সঙ্গে কিছুকাল থাকলেই বুঝতে পারবেন, এই কবির হাতে খুব সহজ ও তুচ্ছ ভাবে বলা কথা চিরকালীন কবিতার অন্তর্গত হয়ে যায় কত অনায়াসে।

এখানে 'কার্নিসের' পরে 'ওপারে' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন তখন, কারণ, তারপরই তিনি অনন্তের মধ্যে স্থাপন করবেন পাঠককে। 'ওপারে' কথাটির মধ্যে ভরা ছিল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটি লুকোনো সংকেত।

এমনই সব সংকেতে সংকেতে ভরে আছে মনীন্দ্র গুপ্তের কবিতা। তা নিয়ে আমরা আবার কথা বলব অন্য একদিন।

শোরুম ও অনুমোদিত বিক্রয়কেন্দ্র : কলকাতা লিন্ডসে স্ট্রিট (২২৮৬১৫১১), ফ্রি স্কুল স্ট্রিট (২২৮৬১৫০৬), কলেজ স্ট্রিট শোরুম (মার্কাস স্কোয়ার ২২১৯৭৯৮৪), বেহালা মার্কেট (২৪৬৮১৩৪১), গড়িয়া বসু মার্কেট (২৪৩০৩০৭৬) হাওড়া (২৬৪১০৬০৮)
ডোমজুড় ▪ নৈহাটী ▪ বর্ধমান ▪ দুর্গাপুর ▪ আসানসোল ▪ বহরমপুর ▪ পুরুলিয়া ▪ জামশেদপুর ▪ ধানবাদ ▪ রাঁচি ▪ হাজারিবাগ ▪ ভাগলপুর ▪ মুজফ্ফরপুর ▪ পাটনা ▪ কটক ▪ ভুবনেশ্বর ▪ আগরতলা ▪ বারানসী ▪ রায়পুর ▪ গুয়াহাটি ▪ দিল্লী

পথের পাঁচালি

শেষ হলে জানা যায় কখনও শুরু হয়েছিল। মরে গেলে জানা যায় কখনও বেঁচেও ছিল। নিয়মটা বুঝি এমনই। বাকি সবকিছু, মাঝখানেরটা, সরে সরে যায় যেন।
জয়া মিত্র

সন্ধ্যামাসি মারা যাওয়ার খবর এল আজ। সন্ধ্যামাসি আমার নিজের মাসি ছিল না, আমার মা সাতভাইয়ের কোলে একবোন। কিন্তু মাসি মায়ের অনেক ছোটবেলার প্রাণের বন্ধু ছিল। মায়ের সেই ইজিপশিয়ান চামড়ায় বাঁধানো অ্যালবামে সব লালচে হয়ে যাওয়া সাদাকালো ছবির মধ্যে মা আর সন্ধ্যামাসির একসঙ্গে নাচের কী সুন্দর ছবি আছে।

মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষের বড়বেলাটা বড্ড বেশি বেশি করে তার একার। সে নিজেই কেবল সে সময়ের, সেই জীবনের খবরগুলো জানে, হাসলে একাই হাসে, কাঁদলে একাই কাঁদে। এমনকী কখনও কখনও সবগুলোই এমন গুলিয়ে যায় যে, যখন হাসে তখনও ভিতর দিকে ফোঁটা-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে বুকের মধ্যে বিন্দু সরোবর হয়ে যায়।

ছোটবেলা কিন্তু তেমন হয়, ছোটবেলাটা বেশ ভেঙেভেঙে অনেকের কাছে ছড়ানো ছড়ানো থাকে। মাঝে মাঝে এক এক টুকরো হাতে পেলে নেড়েচেড়ে দেখে আবার তাদের কাছে থাকাটা তাদেরই কাছে রেখে দেওয়া যায়। তার ছোটবেলার বেশ কয়েকটা টুকরো এরকম সন্ধ্যামাসির কাছে রাখা ছিল। সবগুলো হয়তো ঠিক সন্ধ্যামাসির কাছেই নয়, হয়তো সেই বাড়িটায়। খুব ছোটবেলায় প্রথম সে বেহালা বলে একটা জায়গার নাম শুনল সন্ধ্যামাসির বাড়ি যাওয়া উপলক্ষে। তার আগে তো বেহালা বলতে জানত কেবল চম্পাদির বাবা সুপ্রকাশ জ্যেঠুর সেই হালকামত কাঠের যন্ত্রটাকে, যেটার তারের ওপর চোখ বন্ধ করে ছড় টানলে ভারী সুন্দর সব সুর বাজে। যদিও দু-একবার সে আর চম্পাদি লুকিয়ে লুকিয়ে চোখ খুলে বাজাবার চেষ্টা করে দেখেছে ভয়ানক খারাপ ক্যাঁ কোঁ আওয়াজ বেরয়। কলকাতার সবই অদ্ভুত, সেখানে বেহালা বলে একটা জায়গা থাকে। হারমোনিয়াম কিংবা মৃদঙ্গ নামেও থাকতে পারে হয়ত। তো সেই বেহালায় সন্ধ্যামাসির বাড়িতে কিন্তু তার বেশ ভালই লেগেছিল। সন্ধ্যামাসির মেয়ে তাকে ছাদে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। ইট বাঁধানো বেশ বড় একটা উঠোন আর সবচেয়ে ভাল যে সেই উঠোনের একপাশে চৌবাচ্চার ওপর বসে প্রায় সন্ধে হয়ে আসা পর্যন্ত সে একমনে গল্পের বই পড়েছিল, কেউ তাকে বারণ করেনি। মা আর সন্ধ্যামাসি বেশ নিজেরাই গল্প করেছিল। নিজেদের ছোটবেলার স্কুলের গল্প, আরও কী সব! কী বই পড়ছিল, তাও মনে আছে। মলাটের ছবিটা সুদ্ধ। বইটার নাম বেনহুর। ভাল করে যে গল্পটা বুঝতে পেরেছিল এমন নয়। খুব লোকজন আর গোলমাল ভর্তি একটা গল্প, এটুকুই যা বুঝতে পারে!

পরে সেই বইটা থেকে সিনেমা হয়েছিল আর সেই সিনেমাটার ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল তার। কিংবা হয়তো সিনেমাটা আগেই হয়েছিল, সে জানতে পারল পরে। এটা ঠিক জানে না, কিন্তু রাগ যে কেন হয়েছিল সেটা বেশ জানে। উনিশশো একষট্টি সাল সেটা।

রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর বছর। সে বছরই তারা পাহাড় থেকে কলকাতায় এসেছে, বরাবরের মতো। রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতার সঙ্গে তো সে বেড়ে উঠেছে মনে হয় মায়ের পেটের ভেতর থেকেই, মা এত গান গাইত, এত গান আর নাচ ছিল তার ছোটবেলা ঘিরে, যে সেই এগারো বছরের তার তো 'সঞ্চয়িতা'র অর্ধেকটা কণ্ঠস্থ। সেই রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ উৎসব। কত বড় একটা পুণ্যদিন। এরচেয়ে বড় কোনওদিন তার জীবনে আসেনি তখন পর্যন্ত। তারওপর যে কলকাতা শহরে সে এসে পড়েছে সেখানকার কত যে উৎসবের খবর প্রতিদিনের কাগজে কাগজে। সবচেয়ে বেশি তাকে টানছে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত—দেবব্রত বিশ্বাস/নৃত্যে—মঞ্জুশ্রী চাকী' লেখা বিজ্ঞাপনগুলো। এক সপ্তাহ আগেই একটা সাদা আর্ট পেপারে রবীন্দ্রনাথের এক সাধ্যমতো পোট্রেট এঁকে রাত জেগে গুণে গুণে একশোটা প্রদীপ এঁকেছে তার চারপাশে। যদিও এক আত্মীয়া সে ছবি দেখে বলেছেন রাক্ষসের দেশে রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু ছবি আঁকতে পারা তার মেজকাকা তো খুব সুন্দর হয়েছে বলেছে! আর সেই শতবার্ষিকী উৎসবের দিনটায়, কোনও উৎসবেই নাকি 'ঢোকা যাবে না' বলে তার বাড়ির বড়রা সবাই মিলে কী না চলে গেল গ্লোবে না লাইট হাউসে 'বেনহুর' দেখতে!

এতেও রাগ হবে না বেনহুর সিনেমার ওপর!

সন্ধ্যামাসির সঙ্গে তারপরও দেখা হয়েছে কতবার। তাদের নিজেদের বাড়িতেও। কাকাদের সঙ্গে বেশ ভাব ছিল তার মামাবাড়ির। সন্ধ্যামাসির মেয়ের বা ছেলের বিয়েতেও...

তারপর, আস্তে আস্তে বড় হতে থাকা পৃথিবীর ধুলো। ছড়িয়ে দিতে থাকা হাওয়া। মায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে কোনও কোনও দিন সন্ধ্যামাসির প্রসঙ্গ।

আর আজ এই হঠাৎ। সে যে কোথাও ছিল, তার বার্তা দিয়ে গেল তার চলে যাওয়ার খবরটুকু। মাঝখানের জমা ধুলো কিছু বা ভিজে যায় ভরে ওঠা চোখের দুই বিন্দুতে। এই মনে করা, এই তর্পণ। হারিয়ে থাকার ছলেও রয়ে যাওয়া।

রো
রোববারের
রামপ্রসাদী

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ঊনপঞ্চাশ

টেলিফোন আসার পরদিন বিকেল নাগাদ দত্তপাড়ার এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় পর পর খানকতক লরির ঝড় উঠল। আমরা দৌড়ে দেখতে গেলাম। পুলিন দত্ত জ্যাঠামশাই দত্তপাড়ার মাঠে ঝিরকুটে কালো পেটাই চেহারার পেটের কাছে লুঙি কষে ঘন ঘন নস্যি নিচ্ছেন আর দোফলা আমতলায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে পাশের বাড়ির প্রকাণ্ড ঘোষ পরিবারের হারু কাকাকে ডেকে হেঁকে বলছেন, বাঙাল, শালা বাঙালে দখল করে নিলে আমাদের পাড়া।

ধুলো ওড়া লরিদের আওতায় দাঁড়িয়ে হারু কাকা চোখে হাত আড়াল দিয়ে বলে, কেন কী হল?

পুলিন জ্যাঠামশাই পদে পদে খিস্তি দেন। সেই নিয়মেই তিনি গর্জে ওঠেন, ধুর মাকড়া গর্ভস্রাব। বাংলা কতা বুঝিসনে।

হারুকাকা, খিস্তিটা সমসকৃতে দিচ্ছেন কাকা।

—ওরে বানচোত, টাটু ডাক্তারদের জোড়া পুকুরধারের মাঠখানা ওই শালা রিফুজিরা চোখের সামনে দখল করে নিচ্ছে। কারও খ্যামতা নেই রোখে। এতকাল পরে ওরা এল কোত্থেকে! দেশভাগ তো সেই কবে—মানে এগারো-বারো বছর হয়ে গেল।

হারুকাকা মিটমিট হাসে, এরা এল রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প আর ধুবুলিয়া ক্যাম্প থেকে।

—তা ওখেনেই তো দিব্যি ছিল। এখানে মরতে এল কেন?

—মরতে নয়, বাঁচতে। মাঠখানা ওরা দখল করছে।

—কে পাঠালে ওদের? খবর দিল কে?

—আরে বাবা, ওই জমিটা সবে সরকারে খাস হল যে।

—খাস! কবে হল? আমরা তো কিছু জানি না।

—আপনি জানবেন কী করে। আপনার নিজের কি কম জমি! যাদের এক ফোঁটা মাটিও নেই তারা সব খবর রাখে।

পুলিন দত্ত গর্জে ওঠেন, তোর কাকা সুশীল ঘোষ এখনও খদ্দরধারী কংগ্রেস। আর তুই মদনা কমিউনিস্টের মতো কথা কচ্ছিস!

হারুকাকা ফিক ফিক হাসে, আমার কাকা খদ্দর পরলেও নেতাজির খাস লোক। একসময় ওনার সেক্রেটারি ছিলেন। হাঁপানিতেই ওঁকে কাবু করল। তারওপর ইংরেজ পুলিশ মেরে একটা পা নষ্ট করে দিল। আমার সাইকেলের পেছনে চড়েই তো ঘুরে বেড়ান।

পুলিন দত্ত গলা চড়ান, ওরে শালা। তুমি সুশীলবাবুর ভাইপো হয়ে কমুনিস্টি মারাচ্ছো!

হারুকাকা বাড়ির দিকে যেতে যেতে বলে, মুখ নয় তো, পাইখানা।

উড়ন্ত লরির গর্জনে পুলিন দত্ত সে কথা শুনতে পান না।

একটু পরেই আমরা প্রায় রোজকার দেখা দৃশ্যটা দেখতে পাই হারুকাকার সাইকেল ছুটছে। ক্যারিয়ারে বসে আছেন সুশীল দাদু। ভয়ঙ্কর রোগা, মাথাটা কদম ছাঁট, পড়ো পড়ো চশমার ওধারে বিস্ফারিত চোখ। হাতের লাঠিখানা বুকে সাপটানো। গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। পরণে খদ্দরের হাঁটু তক্‌কো লুঙি। আর কাঁধে খদ্দরের গেরুয়া পাড়ধারী চাদর ফেলা। বুকের আড়াআড়ি কাপড়ের ব্যাগ সাইকেলের পশ্চাতে বসে সদাই ভয়ঙ্কর গম্ভীর মানুষটি হাঁপানির ফোঁকাকল টানছেন আর ফোকলা মুখ কপাত কপাত করছেন। ওটি মনে হয় হাওয়া টানার রকম। দেখলে কষ্ট হয়। এককালের স্বাধীনতা সংগ্রামী, নেতাজির মতো বলবান মানুষের সঙ্গীটি কী অসহায় পরনির্ভরী এখন।

আমরা সব দল বেঁধে জোড়া পুকুরের মাঠে যাই। কি অবাক ভোজবাজিতে এই বিকেলের ঝোঁকে গোটা মাঠখানা মানুষে মানুষে ছয়লাপ। ঘপাঘপ শাবল পড়ছে। কোদাল আপসাচ্ছে। বাঁশের খোঁটা পোঁতা হচ্ছে। পাটকাঠির বেড়া গড়া হচ্ছে। তেরপল চড়ছে মাথার ওপর। ছেলেপুলেগণ হুটোপাটা করছে। একজন এখনও কাঁচা চুলো বৃদ্ধ একধারে বসে নিজের বুটজুতোয় বুরুশ-কালি করছেন। পরণে বাড়িতে কাঁচা ফটফটে শার্ট ধুতি। তাঁকে ডেকে এক আধবুড়ো বলে, আরে খাসনবিশ বাবু, জুতা সাফ অখন রাখেন। ঘর গোছান। খাসনবিশ শান্ত গম্ভীর চক্ষু তুলে তাকে শুধু একবার দেখেন। তারপর আবার জুতো পালিশ। একজন মহিলা চিৎকার করে, বাঙ্কা, অরে বাঙ্কা, কুপিখান কই রাখলি?

আমি মনে মনে হাসি। আর সবার কাছে এসব শব্দ বিটকেল হলেও, আমি এর অনেকগুলো জানি। আমার মামার বাড়ির আদি দেশ তো পাকিস্তানের ফরিদপুর। মা বলে, গ্রামের নাম, মাওইসার। জিলা, মাদারিপুর। এখানে, এত সব হঠাৎ মানুষের মধ্যে মাদারিপুর কি নেই! আমার পারুলবালা দিদিমা, কিংবা তাঁর মা কুসুমকুমারীকে এখানে নিয়ে এলে ঠিক খুঁজে বার করত। আমার দিদিমা শুধু চন্দ্রবিন্দু বর্জিত হলেও তাঁর মা, যাঁকে আমরাও দিদিমা বলি বাবা-মা'র দেখাদেখি, প্রায়ই কপট রাগে বলে ওঠেন, আরে থো। বাপেরও দিদিমা, পুতেরও দিদিমা। কতবার বলি বাংলায় কথা বলো না দিদিমা। অমনি ঝটকা জবাব ফেরে, হালা, পুঙ্গির পুত।

এই গালাগালটার মানে না জানলেও বুঝি এটা খুব খারাপ কথা। যেমন তিনি মাঝে মাঝেই রেগে গেলে 'লোম' কথাটি ঝাঁঝান। তার মানে কি আরও খারাপ?

চোখের সামনে এফআরসিএস ডাক্তার শ্যামাচরণ চাটুজ্যে ওরফে টাটু ডাক্তারের মস্ত মাঠখানার চেহারা পাল্টে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে মাঠের মাথায় দিনের আলো গোটাতে থাকে—ঠিক যেন প্রকাণ্ড পুকুরে টানা জাল দেওয়া হচ্ছে। গুমোট দিনের পাট তুলুনি মুখে কোথা থেকে হাওড়া ছাড়ে ফিনফিনে। ওধারে জোড়া পুকুরের মাঝখানকার আলাদা করে দেওয়া বাঁধ ধরনের পথে এই নতুন কুচো-কাঁচাগণ হুটোপাটি তুলে খেলে বেড়ায়। কোথাকার শিশু কোথায় এসে হেসে কুটিপাটি। মাঠময় বাঁশগাড়ি আর পাটকাঠি পোঁতা দখলদারি পর্ব দুদ্দাড় চলে। কোনওমতে তৈরি করা ডেরায় ডেরায় বাতি জ্বলে ওঠে। কারা সব শাঁখে ফুঁ দিয়ে সন্ধেবাতি দেয়। জোকার পড়ে এস্তার।

এমনি সময়ে নরহরি ওরফে নরিকাকা, উড়িয়া মালিকে সঙ্গে নিয়ে মাঠের ধারে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ান

দাদু, টাঁটু ডাক্তার। টুকটুকে পাকা আম বৃদ্ধ। পরণে পাজামা, গায়ে টাওয়াল গেঞ্জি, আর কাঁধের ওপর প্যাট করে যত্নে ফেলে রাখা তোয়ালে। পাকা চুল সিঁথি কেটে আঁচড়ানো, চমৎকার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে চশমা। ডাঃ শ্যামাপদ চাটুজ্যে, এফআরসিএস।

এই টাঁটু ডাক্তারের বাবা তারিণী চাটুজ্যে ছিলেন এ অঞ্চলের হেঁকোডেকো ব্যক্তি। ওঁদের অট্টালিকার নাম তারিণী ভবন। এই টাঁটু যৌবনে বিলেত গেলেন এফআরসিএস পড়তে। পাস করে ফেরার পর ওঁদের পরিবারকে এক ঘরে করল এখানকার কঠিন বামুনরা। টাঁটুর বাপ ছেলেকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দানাদি সেরে বামুন ভোজন আর বহু লোক খাওয়ালেন। পরবর্তীতে এফআরসিএস টাঁটু কলকাতায় চুটিয়ে প্র্যাকটিস করতে লাগলেন। তাঁর ছুরি কাঁচিতে মরো মরো প্রাণ চাগাড় দিতে লাগল। কিন্তু হালিসহরের লোক আহ্লাদ করে কলকাতায় দেখাতে গেলে পুরো ফিস নিতেন। একসময় বাংলা ছেড়ে চলে যান পাঞ্জাবের ঝিন্দ স্টেটে। সেখানে রাজার প্রধান ডাক্তার হয়ে চাকরি নেন। রিটায়ার করে ফিরে এলেন দেশ হালিসহরে। মিউনিসিপ্যালিটির দাতব্য হাসপাতালে তাঁর তাবৎ অপারেশন করার বিলিতি অস্ত্রশস্ত্র দান করেছেন। একটি বেড করে দিয়েছেন বাবার নামে। এখন চিকিৎসা ছেড়ে সকাল সন্ধে গোটা দু-তিন মস্ত বাগান সামলান। নরি কাকা, দ-হরিকাকা, নটহরি, পূর্ণ ঠাকুর ইত্যাকার জুটিয়ে আনা ওড়িয়ারা সেইসব বাগান চষে, সাজায়।

টাঁটু দাদু তাঁর হাতে ধরা বিলিতি ভাঁজ করা স্টিলের লাঠিখানার ভাঁজ খুলে মাটিতে পুঁতে দিতেই ওটা গোল টুল হয়ে গেল। তিনি নির্বিকার মুখে তার ওপর বসে বসে জমির ভোজবাজী দেখতে লাগলেন। দেখেন আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে আলগোছে হাত বোলান।

মাঠময় টিমি টিমি বাতির দেওয়ালি ঘটতে থাকে। সেই সঙ্গে হঠাৎ হাওয়ার তোড়ে আঁকা বাঁকা সাপ উলু উলু উলুধ্বনি। কী আশ্চর্য ভূমি দখলের উৎসব।

রাজার খাস অনুচর বন্দ্যো সুখময়ের তরফ থেকে যে কাঁচা খবরটি জারি ছিল, সেটি পাকাপোক্ত হল তাঁর আগমনে। কুমারহট্ট-হালিসহরে রাজার বজরা এসে ভিড়ল সকাল হওয়ার খানিক পরেই। প্রসাদ সে সময় গঙ্গার ঘাটে স্নানে ছিলেন। ফলে দর্শন হয়ে গেল ওখানেই।

প্রসাদ কোমরজলে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলেন রাজার বাহারি বজরা। সুমুখে ময়ূর মুখপত্তন আর ভারী রংদার। কাঠের গায়ে খোদাই করা কারুকাজের চমৎকার চিত্রমালা, কোথাও যুদ্ধ আবার কোথাও গীতবাদ্য আয়োজন। এই অভিনব যোগ সম্মিলন, একই লপ্তে যুদ্ধ ও সঙ্গীত দেখে প্রসাদ মনে মনে চমৎকৃত হন। কখন কোনও ছবি অথবা বিষয় কোনও মুখে কার সঙ্গে এসে মিলে যায় তার কোনও আগাম হিসেব হয় না। সংসারটি সাজানো গোজানো দেখতে হলেও আদপে সে অতি অসংলগ্ন। আর এই এলোমেলো অবস্থানের ভিতর দিয়েই বহু ঘুর পথে একজন অপরের সঙ্গে কী অভিরাম লুকনো গাঁটছড়া বেঁধে বসে তাকে। সেই বাঁধাবাঁধির খপর সহজে জানা যায় না। তার হিসেবটি সংসারের অতীত, সদাই অধরা অলীক এই বিশ্বপ্রকৃতির মায়া রহস্যের লীলা ভাণ্ডার। অথচ এইরকমটাই হয়ে আসছে চিরকাল। এই পরিদ্যাবা পৃথিবীর জন্মকাল ইস্তক।

রংদার বজরায় মখমলি পর্দা খেলছে সকালবেলাকার হাওয়ায়। গোড়ার দিকে কাঠের পাটায় বসে এক বাজনদার শিঙ্গা ফুঁকে রাজ আগমন ঘোষণা কল্লে। বজরা এসে লাগল ঘাটের গায়ে। ঘাটে স্নানার্থীরা অবাক করজোড়ে তটস্থ হয়ে রইল। খালাসিরা দ্রুত জলের আড়াআড়ি একখানি পাটা ফেলে দিলে বজরার সঙ্গে যোগ করে। দু'জন একটি কাঠের দণ্ড ধরে দাঁড়ালে ওপরে ও নীচে। মহারাজা সেটি বাঁ হাতে ধরে ধীরেসুস্থে নামতে লাগলেন মাটির দিকে। আর নামতে নামতেই জলে দাঁড়ানো রামপ্রসাদকে দেখে মৃদু হাস্য করলেন। প্রসাদ হাত জোড় অভিবাদন জানালেন।

রাজা চলে গেলেন রাজকীয় নিয়ম মোতাবেক ঘাটে রাখা পালকি চড়ে তাঁর বিরামকুঠির দিকে। ঘাট থেকে ওই ফাঁকটুকু একজন গালপাট্টা ছত্রধর তাঁর মাথায় ঝালর দুলন্ত মস্ত আর রঙিন ছাতাখানা বাগিয়ে ধরে রইল। ঘাটস্থ বেটামানুষগণ জোড় হাত করেই রইল।

ঘাটে আসা একমাত্র রমণী এক বুড়ি প্রসাদকে হেঁকে বলে, ধন্যি আমাদের দেশের ছেলে পেসাদ। দেশের রাজা তাকে দেখে খাতির কল্লে।

প্রসাদ হেসে কন, দয়াময়ী পিসিমা গো, সবই তোমার দয়া।

বুড়ি অবাক চোখ কপাল তোলে, ও মা কী ভাগ্যি আমার। আমার মতো গরিব বেধবাকে তুই পিসি বলে সম্মান কল্লি। তোর জগৎজোড়া নাম হোক বাপ।

প্রসাদ বলেন, ও মা সে কী কথা। পিসিকে মাসি বলি কেমন করে। তুমি যে আমার বাপের তরফে গো। তোমার পুত্তুর গদাধর যে আমার ছেলেবেলার ইয়ারদোস্ত পিসিমা।

বুড়ি মুখে চুক চুক শব্দ করে, আহা মরে যাই, মরে যাই। একই গাঁয়ে বাস করি। কিন্তু তোকে যে কদ্দিন পরে দেকলাম বাপ।

—তুমি খ্যাল না কল্লেও আমি কিন্তু হরবখতই তোমায় গঙ্গা নাইতে দেখি পিসিমা।

বুড়ি নিদন্ত মুখ পাকলে হাসে ভারী চমৎকার। একদিন মোদের ঘরে আসিস ছেলে। নারকোল নাড়ু, মোয়া খাওয়াবোখন।

পাশ থেকে আর এক স্নানার্থী ফুট দেন, কালীর বেটা হবে নাড়ুগোপাল।

প্রসাদ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন লোকটিকে। কুমারহট্টর এক চতুষ্পাঠীর যুবা পণ্ডিত। স্নান সেরে জলে দাঁড়িয়েই কষে শিখা বাঁধছে।

প্রসাদ হেসে বলেন, কালী আর রাসবিহারি কি ভিন্ন, ন্যায়রত্নঠাকুর।

ন্যায়রত্ন বক্র হেসে কন, তোমার মতো খোয়ারিতে থাকলে তো সবই ঘণ্ট পাকানো। তবে কি না আমরা তো শাস্ত্র ব্যবসায়ী। সেখানে অনাচার করি কেমন করে বলো।

রামপ্রসাদ মৃদু হেসে মাথা নিচু করেন, তা বটে, তা বটে। আমার জাত ধর্ম, নিয়ম কানুন সব খেয়ে বসে আছি। তাই প্রভেদ পাইনে কোনও কিছুরই।

ন্যায়রত্ন লোকটি আরও কী যে বলে যায় অংবঙিয়ে,

প্রসাদ কানে নেন না। তাঁর তাড়া আছে যে। ঘরে যাওয়ার পথে একবার রামতনুকে দেখে যেতে হবে। তত্ত্ব করতে হবে তার ঢোলকটি কী প্রকার আছে।

দুপুরের পর এক পশলা ঝেঁপে বৃষ্টি হয়ে সংসারটি ধুয়ে মুছে সাফ সুতরো হয়ে যায়। গরমদিনের তাপঝাল জুড়িয়ে মিঠে মিঠে বাতাস ছাড়ে। আর সেই বাতাসের মুখেই সুখময় বন্দ্যো এসে উপনীত হন প্রসাদের দুয়ারে। তাঁর কাছে কতিপয় খপর প্রসাদের জন্য। সে সবই রাজ সম্পর্কিত। তার সঙ্গে দেশের অবস্থা ও অবস্থান জড়িয়ে আছে। আর আছে সিরাজ নবাবি কুরসিতে বসবার আগেই তাঁর সম্পর্কে বিবিধ আতঙ্ক প্রচার। তার কতক সত্য, কতক কু প্রচার।

কিন্তু বন্দ্যোর খপর অনুযায়ী বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি এখন শয্যাধীন গুরুতর অসুস্থ। সেই সঙ্গে প্রখর যুদ্ধব্যবসায়ী নোয়াজেস, রাজবল্লভ, হোসেন কুলি খাঁ ইত্যাকার ব্যক্তি অসুস্থ নবাবের প্রায় অচেতনতার সুযোগ নিতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু নবাবের বাসনা অনুযায়ী উদরি রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ নবাব হতাশা বশত বৈদ্যের চিকিৎসায় বিফল হয়ে ঔষধ সেবন বন্ধ করে দিন গুনছেন। সকলে বুঝতে পারল জীবন প্রদীপ নির্বাপণে যেতে বসেছে। এ দিকে সিরাজের ভবিষ্যদাকাশ ঘোরতর তমসা পীড়িত হয়ে উঠতে লাগল। কী আছে নসিবে, তার খপর কে রাখে।

এক দিবস বৃদ্ধ নবাব দৌহিত্রকে কাছে ডেকে সর্ব সমক্ষে কতিপয় সান্ত্বনাবাক্য শোনাতে লাগলেন।

আমি এই যে আজীবন অসি হস্তে জীবন যাপন করে সংসার হতে অবসর নিলাম, এত যুদ্ধ করে রাজ্য রক্ষা করলাম সে সবই তো তোমার জন্য।

তোমার ভবিষ্যত দুর্গতির কথা ভেবে আমি রজনীতে বিনিদ্র। তোমার শত্রুদের আমি চিনি। তুমি তাদের জানো না।

হোসেল কুলি খাঁ তোমার পথের কন্টক ছিল। শত্তকত জঙ্গের অনুগত এই ব্যক্তি এখন মৃত।

দেওয়ান মানিকচাঁদ, যে তোমার প্রবল শত্রু, তাকে আমি একটি রাজপ্রাসাদ গড়ে দিয়ে ক্ষান্ত করেছি।

এখন তোমায় আর কী বলি। আমার শেষ উপদেশ হল ইওরোপীয় বণিকদের উপর কঠিন নজরদারি জারি রেখো। তারাই তোমার প্রধান আশঙ্কার হেতু।

কিন্তু সমুদয় ইওরোপীয় বণিকদের এক লপ্তে পদানত করার চেষ্টা কোরো না। তোমার প্রধান দমনের বিষয় হল ইংরেজ। তাদের ক্ষমতা ইতিমধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই এই ইংরেজদের দমন করতে পারলে অন্যান্য ইওরোপীয় বণিকরা আর ফণা মেলতে পারবে না। তুমি কিছুতেই ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ বা সৈন্য সংগ্রহ করতে দিও না। যদি দাও তাহলে এ দেশ আর তোমার রইবে না।

বন্দ্যো এই বিবরণ শেষে আর একটি চমকপ্রদ কথা শোনালেন। কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠিতে ডাক্তার ফোর্থ নামে এক বিচিত্র ব্যক্তি থাকেন। তিনি একাধারে চিকিৎসক ও কোম্পানির কর্মচারী। মালগুদামে বসে যেমন দাদনের খাতাপত্র সারেন, তেমনই প্রয়োজনে বন্দুক ঘাড়ে যুদ্ধে যেতেও তোয়ের থাকেন। এই ডাক্তারটি ভারী ধুরন্ধর। যেহেতু বৃদ্ধ নবাবের শেষবেলার চিকিৎসক, তাই সেখানে তিনি অবারিত দুয়ার। আলিবর্দি রোগী, তিনি চিকিৎসক। যদিও নবাব এখন দাওয়াই বর্জন করেছেন।

এ দিকে রাজবল্লভের সঙ্গে কাশিমবাজারে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। কৃষ্ণবল্লভ কলিকাতায় ঠাঁই নিয়েছেন। ওধারে ঘসেটি বেগম আঁক কষছেন নবাবি সিংহাসনের দিকে গুটি গুটি। এমতাবস্থায় ডাক্তার ফোর্থ এক সকালে নবাবের কাছে উপনীত। এমন কালে সিরাজ সেখানে যেয়ে নিবেদন করলেন যে, তিনি খপর পেয়েছেন—আমরা নাকি ঘসেটি বেগমকে সাহায্য করতে স্বীকার হয়েছি।

বৃদ্ধ নবাব তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকালেন, এ কথা কি সত্য?

ফোর্থ বলেন, এ কথা মিথ্যা। এ হল শত্রুর অপপ্রচার ও জনরব তৈরি করার কল। ইংরাজ আদপে বণিক। তারা সৈনিক নয় যে রাষ্ট্রবিপ্লবে নেমে পড়বে। তারা বাণিজ্য করেই সন্তুষ্ট।

নবাব, তোমাদের কাশিমবাজারে কুঠি না কেল্লা? সেখানে কতজন সৈন্য থাকে?

ডাক্তার, কর্মচারী সমেত মোট ৪০ জন মাত্র।

নবাব, কখনও কি তার অধিক থাকত না?

ডাক্তার, থাকত জাঁহাপনা। তবে সে কেবল বর্গীর হেঙ্গামার সময়ে। বর্গীর ঝামেলা প্রশমিত হতেই তারা সব কলিকাতা চলে গিয়েছে।

—তোমাদের যুদ্ধজাহাজ কোথায় থাকে?

—বোম্বাই।

—সে সকল জাহাজ এ দেশে আসবে কি?

—তার কোনও কারণ তো দেখছি না।

নবাব, তিনমাস পূর্বে তোমাদের কতিপয় যুদ্ধ জাহাজ এখানে এসেছিল। তার হেতু কী?

ডাক্তার, যথার্থ। তবে এমন তো প্রতি বছরেই দুই একখানি জাহাজ এসে থাকে। উদ্দেশ্য হল রসদ সংগ্রহ করা।

নবাব, এ প্রদেশে যুদ্ধ জাহাজ আনবার প্রয়োজন কী?

ডাক্তার কোম্পানির বাণিজ্য রক্ষা আর ফরাসি যুদ্ধের আশঙ্কা নিবারণ করা।

নবাব, ফরাসিদের সঙ্গে তোমাদের কি আবার যুদ্ধ বেধেছে?

ডাক্তার, এখনও বাধেনি। তবে আশঙ্কা আছে।

সুখময় বন্দ্যোর এতসব বিবরণ যে একেবারে ঘোড়ার মুখের, এ নিয়ে প্রসাদের কোনও সংশয় থাকে না। শুধু তাঁর বিস্ময়, একজন বুনো কবি কেমন করে আস্তে আস্তে রাষ্ট্রযন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়ছেন। দেশের তাবৎ কূটনীতির সমাচার তাঁর মতো সাধারণ জনের মস্তিষ্কে চালান করা হচ্ছে। রামপ্রসাদও কীরকম মোহগ্রস্তের পারা, এই সব রাজারাজড়ার বৃত্তান্তে তলিয়ে যাচ্ছেন।

বন্দ্যো আর বলেন, আজ সন্ধেয় রাজার আলয়ে তোমার আর আজুর গাওনা যুদ্ধু হবে। সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছ তো?

প্রসাদ মৃদু হাসেন, হ্যাঁ, যুদ্ধের ব্যবস্থা পাকা বৈকি।

(চলবে)

ছবি শান্তনু দে

রো
রোববারের
মেগা

ঝিলডাঙার কন্যা

প্রচেত গুপ্ত

সোমনাথ ঠিক করেছে সে চাকরি ছেড়ে দেবে। ভেবেছিল কমল মল্লিককে সে ফোনে জানাবে। তবে তার আগেই কমল মল্লিক তাকে একটা বিশেষ কোনও দরকারে অফিসে ডেকে পাঠায়।

নয়

মোহনের মুখে 'খবর ভাল নয়' শুনে কাদুর ভুরু কুঁচকে গেল। একথা শুনতে সে অভ্যস্থ নয়। মোহন, শোলদের রাখাই হয়েছে ভাল খবর শোনানোর জন্য। কাদুর ইচ্ছে করল, মোহনের গালে একটা চড় লাগায়। আজ প্রথম নয়, এরকম ইচ্ছে কাদুর আগেও অনেকবার হয়েছে। কিন্তু কোনওবারই সে তা করে না। ঠান্ডা গলায় বলল, 'কেন? ভাল নয় কেন?'

হ্যারিকেনের আলোয় চুলটা ঠিক আঁচড়ানো যাচ্ছে না। এখানে একটা ব্যাটারির ব্যবস্থা করা যায় না এমন নয়, করা যায়। কী আর এমন খরচ। কিন্তু সেটা বোকামি হবে। এই বাড়িতে হঠাৎ আলো জ্বললে লোকের চোখে পড়ে যাবে। সেটা এখনই ঠিক নয়। ক'দিন পরে করতে হবে। আর একটু গুছিয়ে নেওয়ার পর তখন লোকের ভাবাভাবিতে কিছু এসে যাবে না।

মোহন বলল, 'শোল এসেছিল। সদানন্দ রাজি হচ্ছে না। বলছে, জমি ছাড়বে না। সেই বাপ ঠাকুরদার গপ্পো মারছে।'

গাটা কেমন চ্যাটচ্যাট করছে। স্নান করলে ভাল হত। এ বাড়িতে একটা ভাল বাথরুম থাকা উচিত। করলে কেমন হয়? শহরের মতো বাথরুম। কল, শাওয়ার, ইংলিশ পায়খানা থাকবে। একটা বাথটাব থাকলে আরও ভাল। শান্তিকে নিয়ে একসঙ্গে স্নান করা যাবে। জলকেলি।

কাদু মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'জমি তো আমি নিতে চাইনি মোহন। জমি নিয়ে আমি কী করব? আমার কি জমিজমায় মন আছে রে পাগল। জমি সদান্দরই থাকবে। সে-ই চাষবাস করবে। ফসলও কাটবে। শুধু কাটার পর ধানটা নিজের ঘরে না নিয়ে অন্নদা রাইস মিলে জমা দিয়ে আসবে। ব্যস। নিজে না পারলে আমার মিল থেকে গাড়ি আসবে। বিনি পয়সায় তো জিনিস নিচ্ছি না। দাম দিয়ে নেব। ধারবাকির কারবার কাদুর চোদ্দ পুরুষ করে না। শুয়োরের বাচ্চাটাকে এই সামান্য কথাটুকু বুঝিয়ে বলতে পারলি না তোরা?'

মোহন মাথা নামিয়ে বলল, 'সবই বলা হয়েছে। তাও সদানন্দ রাজি হয়নি। শোল তিন দিন ধরে বুঝিয়েছে।'

কাদু তাকের একপাশ থেকে পাউডারের কৌটোটা নামিয়ে গলার কাছে উপুড় করল। না, গন্ধটা ভাল না। এ ঘরে একটা ড্রেসিং টেবিলও রাখা উচিত। মেয়েছেলের আসা যাওয়ার ঘর। ড্রেসিং টেবিল ছাড়া মানায়? ওপরে বড় আয়না, নিচে পাউডার, সেন্ট, ওডিকোলন।

'এইটাই হয়েছে মুশকিল। বুঝলি মোহন, এইটা হয়েছে মুশকিল। পাড়া গাঁয়ের মুখুসুখ্য মানুষ নিজের ভাল বুঝতে চায় না। ঘাড় ধরে বোঝালেও বুঝতে চায় না। তখন পাছায় লাথি মেরে বোঝাতে হয়। এই যে সেদিন রাতবিরেতে মাইতিদের গোডাউনটা পোড়াতে হল, সে কী আর এমনি এমনি? লোকটাকে এত করে বললাম, এত করে বললাম, কেন বেফালতু ঘরটা ফেলে রেখেছ বাবা? দিয়ে দাও। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ঝিলডাঙায় একটা ভিডিও হল বানাই। ঝিলডাঙার লোকগুলোর জন্য কিছু করাও হল, আবার আমারও দুটো পয়সা হল। সদর থেকে হিট বই আনব। বইয়ের মাঝখানে মাঝখানে ইয়ে ছবি থাকবে। তার জন্য আলাদা পয়সা লাগবে না, ফ্রি। ইস্টিল, মুভি দু'রকম ছবিই দেখাব। তা কে শোনে কার কথা? হারামজাদা গোঁ মেরে বসে রইল। গোডাউন দিলে না। লাভটা কী হল? কোনও লাভ হল না। এখন থাক, পোড়া গোডাউন নিয়ে আঙুল চোষ। আমার কাছে এসেছিল। আমি বলেছি, পোড়া মাল নেব না। সারাইয়ের খরচায় পোষাবে না। মুখ শুকিয়ে চলে গিয়েছে। আবার আসবে। এসে পায়ে ধরবে। তখন হাফ দাম দেব। তাও টাকা একবারে দেব না। খেপে খেপে দেব। ভয় হচ্ছে সদানন্দটারও সেরকম কিছু না হয়ে যায়। এই ধর ঘরবাড়ি পুড়ে মুড়ে গেল।'

কাদু ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। অন্ধকার নামতে আর বেশি দেরি নেই। মোহন দরজায় তালা দিয়ে হ্যারিকেন নেভাল। বলল, 'শোল বলছিল, ওস্তাদ যদি পারমিশান করো কাল পরশু একটা ভাল দিন দেখে সদা'র পেটে মেশিন ঠেকিয়ে দেবে।'

চমকে উঠল কাদু। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

'খবরদার না। ও কাজটিও করা চলবে না। গ্রামের মধ্যে ওসব একদম নয়। বলা যায় না, আজ বাদে কাল ইলেকশনে দাঁড়তে পারি। তখন কী হবে? কেউ যদি হাত তুলে দেখায়? ইলেকশনে সব হয়, কিন্তু গায়ে কালি লাগানো যায় না। বুঝলি মোহন একটা জিনিস ভাবছি।

বড় জিনিস।'

'কী জিনিস গুরু?' মোহন একগাল হেসে বলল।

ইলেকশনের কথা শুনে মোহন উত্তেজিত। গলায় গদগদ ভাব এসে গিয়েছে। দু'জন পাশাপাশি হাঁটছে। কাদু পায়জামা দু'হাত দিয়ে একটু তুলে সাবধানে হাঁটছে। এখনও কুয়াশা পরার সময় হয়নি। তবু সামনের আকাশে একটা আবছা পর্দার মতো। উনুনের কাঁচা ধোঁয়ায় এরকম হয়। উঠতে চায় না। থম মেরে থাকে। কুয়াশার মতো লাগে।

কাদু যেন খানিকটা আপনমনেই বলতে থাকে —

'একটা বড় বিজনেসের কথা ভাবছি রে মোহন। খুব বড় বিজনেস। নামলেই শালা কাঁচা পয়সা।'

'কী বিজনেস?'

কাদু নিজের মনেই হাসল। মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'কেনাবেচার বিজনেস। কেনা অ্যান্ড বেচা। কিন্তু তার আগে মানা সরকারকে পাকড়াতে হবে। হারামজাদাকে না ধরতে পারলে এখানে এই ব্যবসা চালানো কঠিন। এ তোর ছুটকোছাটকা জুয়োর বোর্ড, মালের ঠেক আর ব্লু চালানোর ভিডিও হল নয়। এক একবারে হাজার লাখের কারবার। এই কাজে অনেক কষ দরকার। হারামজাদা মানাটাকে আগে কষে বেঁধে ফেলতে হবে। নে মোহন তাড়াতাড়ি পা চালা। একবার সদার ওখানে যাব।'

'আজই যাবে?'

কাদু মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কেন অসুবিধে কীসের?'

মোহন আমতা আমতা করে বলল, 'না, অসুবিধে তেমন কিছু নেই। শোল বলছিল বুড়োটা নাকি আজ মেজাজ তিরিক্কি করে আছে। ওর ছেলের বউ দু'বার ফিট গিয়েছে।'

'ফিট্ গিয়েছে!'

হ্যাঁ, গোপীডাক্তার এসেছিল। গাধাটা প্রথমে কিছু পারেনি। শেষ পর্যন্ত জুতো শুকিয়ে জ্ঞান আনতে হল। তাও এমনি জুতোতে হয়নি, পুরনো জুতো লেগেছে।'

কাদু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাপের মতো কুতকুতে চোখে গলা নামিয়ে বলল, 'খবর পাকা?'

'পাকা মানে, পুরো পাকা দাদা। শোল নিজে সেই সময় ওই বাড়িতে দাঁড়িয়ে। সবে সদার সঙ্গে কথা বলে বেরবে বেরবে করছে। এমন সময় শোনে হই হই কাণ্ড।'

কাদু তার নোংরা দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'তাড়াতাড়ি পা চালা মোহন। তাড়াতাড়ি পা চালা। জুতো শুকিয়ে কি আর মানুষের চিকিচ্ছে হয় রে? ওই মেয়ের ঘটনা অন্য?'

'কী ঘটনা?'

কাদু ধাতানি দিয়ে বলল, 'তুই জেনে কী করবি? চল, চল তাড়াতাড়ি পা চালা।'

ওস্তাদের ধাতানি মোহন গায়ে নিল না। বোকার মতো হেসে লম্বা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মোহন বলল, 'ইস বাইকটা আনলে হত। কার কাছে যাবে? সদা?'

'না আগে, গোপীনাথ। গোপীডাক্তার।'

ডাক্তারের থাকে চেম্বার, ঝিলডাঙার গোপীনাথ ডাক্তারের আছে মুদিখানা। বাজারের একপাশে। দোকান খোলে সকাল সাতটায়, বন্ধ সেই রাতে।

গোপীনাথ এই গ্রামের একমাত্র ডাক্তার। ডাক্তারি তার আসল ব্যবসা নয়। আসল ব্যবসা মুদিখানা। আজকাল আসল ব্যবসায় শুধু হয় না। সংসারে টানাটানি চলে। সাইডে একটা কিছু নিতে হয়। গোপীনাথ ডাক্তারি নিয়েছে। ডাক্তারির প্রধান অসুবিধে হল জায়গা। জায়গা ঠিক মতো না হলে হাজার ভাল চিকিৎসাতেও পসার জমবে না। গোপীনাথের সে অসুবিধে নেই। মুদিখানায় লোকজনের আসা যাওয়া লেগেই আছে। তেলটা, নুনটা বেচতে বেচতে চিকিৎসা চলে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের সরকারি বেসরকারি কোনও ডিগিই গোপীনাথের নেই। এতে সুবিধে হয়েছে। অ্যালপাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজি তিনটিই সে নিশ্চিন্ত মনে রোগীদের ওপর ব্যবহার করতে পারে। খই, মুড়ির সঙ্গে দোকানে ওষুধও রাখে। বড় কিছু নয়, ছোটখাটো সব ওষুধ। এখনও ইনজেকশন দিতে পারে না, তবে ইচ্ছে আছে শিখে নেবে। কেউ কেউ তাকে সাবধান করেছে।

'দেখ গোপী, ফোঁড়াফুড়িতে কিন্তু বিপদ আছে। মানুষ টেসে দিও না আবার।'

গোপীনাথ একথায় পাত্তা দেয় না। মানুষ কী না পারে। সাগর পেরিয়ে চলে যায়, পাহাড় ডিঙিয়ে হাঁটা মারে। আর সামান্য ইনজেকশন পারবে না? বয়েসের কারণে হাত একটু যে কাঁপে না, এমন নয়, তার মানে এই নয় হাতের বদলে পায়ে সিরিঞ্জ ফুঁড়বে।

তবে যে যা-ই বলুক, ঝিলডাঙা থেকে কয়েক ঘণ্টার পথ ঠেলে বানেরহাটের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত মোটামুটি চালিয়ে দেয় গোপীনাথ। গাঁয়ের লোকে এতই খুশি। পাশ করা বড় বড় ডাক্তার সব ফেল মেরে যায়, পটাশ পটাশ করে মানুষ মারে, তাহলে? পাশ না করা ডাক্তার এর বেশি কী করবে?

তবে চিকিৎসায় ধার বাকি রাখে না গোপীনাথ। চালে ডালে ছাড়লেও ডাক্তারের ফিজ থেকে ওষুধের দাম সবটাই তার নগদে কারবার। ধারের কথা বললে বিরক্ত হয়। ঠোঙায় মুড়ি দিতে দিতে বলে, 'আরে বাবা, এই সহজ কথাটা বুঝলে না হে? চাল ডালে হয় খিচুড়ি। চিকিচ্ছেতে কি খিচুড়ি হয়?'

'খিচুড়ি! চিকিচ্ছেতে আবার খিচুড়ি কী গো!'

মুড়ির ঠোঙায় ঝাঁকা মারতে মারতে গোপীনাথ বলে, 'সেটাই তো বলছি। চিকিচ্ছে হল একটা আলাদা জিনিস। মাথার বেদনায় একরকম তো পেটের বেদনায় আর একরকম। আবার বেদনা তোমার বুকে হলে সে ব্যবস্থা অন্যরকম। চাল ডালের মতো দু'টো বেদনা মিশালে চলে নাকি? তবেই বলো, ধার বাকিটা রাখি কী করে?'

'কিন্তু টাকা পয়সার যে খানিক টানাটানি চলছে গো ডাক্তার।'

গোপীনাথ মুড়ির ঠোঙা দাড়িপাল্লায় তুলতে তুলতে বলে, 'এইটা তো লক্ষণ ভাল। টাকা পয়সা থাকলে তবেই তো তোমার টানাটানির খেলা জমে। না থাকলে কীসের টান? সবই তো ফক্কা। তাই না? তবে এবার ভাবছি তোমাদের জন্য ফুঁ চিকিচ্ছেটা শিখে নেব। নাও ধরো।'

ঠোঙা এগিয়ে ধরে গোপীনাথ।

'ফুঁ চিকিচ্ছে! সেটা আবার কী?'

গোপীনাথ রহস্যময় হাসে। সাদা খোঁচা খোঁচা দাড়ির ফাঁকে তার ফোকলা দাঁত বেরিয়ে পড়ে।

'হ্যাঁ, ফুঁ চিকিচ্ছে। এই চিকিচ্ছেতে তোমার ওষুধ বিষুধ লাগে না। চোখ বুঁজে মাথায় ফুঁ দিলেই ব্যস। ওটাই ওষুধ। তবে বিদ্যেটা শিখতে হবে। যেমন-তেমন হলে চলবে না। তিনবার না চারবার, জোরে না ধীরে, তার তোমার আলাদা আলাদা কায়দা কানুন আছে। পাতলা পায়খানা বন্ধে যটা ফুঁ, কোষ্ঠকাঠিণ্যে তো আর তা দিলে চলবে না। শুনেছি সেই ফুঁয়ের সংখ্যা বেশি কিন্তু জোর কম।'

'তাই নাকি!'

ষাট পার হওয়া গোপীনাথ চোখ বড় করে বলে, 'নয়তো কী? অবশ্য জিনিস তোমার সস্তা হবে। খুবই সস্তা। তোমাদের মতো গরিবগুব্বোদের পক্ষে সুবিধে। ফুঁ-এর আর দাম কত? শুধু সাহস করে একবার শিখে নিলেই হল। তবে সে সাহস গোপী ডাক্তারের আছে। আছে কিনা বলো? তুমিই বলো হে।'

সেই 'সাহসী গোপীডাক্তার' দোকানের ভেতরেই কাদুকে বসবার মোড়া পেতে দিল। পাশে রাখা হাতপাখাটা একবার তোলে, একবার নামায়। হাওয়া কি দেবে? বুড়ো মানুষ হয়ে একটা সুস্থ সবল তাগড়া ছোকরাকে হাওয়া করা উচিত নয়। আর সেই ছোকরা যদি বদের বাসা হয় তাহলে তো আরও উচিত নয়। বাজারে পাঁচটা মানুষ আসা যাওয়া করে। তারা যদি দেখে, কাদুর মতো একটা নরকের কীটকে গোপীডাক্তার হাতপাখা দুলিয়ে হাওয়া করছে তাহলে সম্মানটা কি আর থাকবে? খুবই লজ্জার হবে। তবে কী, সব ক্ষেত্রেই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। এই ধরনের খারাপ মানুষরা হল গিয়ে এই ব্যতিক্রম। এদের খাতির যত্ন করা লাগে। কখন মেজাজ বিগড়োয় ঠিক নেই। হারামজাদা গণেশটা এই সময় গেল কোথায়? একটু চা এনে দিতে পারত।

গোপীনাথ গদগদ গলায় বলল, 'বাবা কাদু, একটু মুড়কি খাবে? খাও, ভাল মুড়কি। গুড়ের নয়, চিনির জিনিস। একমুঠ মুখে ফেলে জল খাও।'

কাদু পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে। নিয়ম মতো তোলা পা নড়ার কথা। কাদুর দুলছে অন্য পা। দোকানের হ্যারিকেনের আলো তার মুখে পুরোটা পড়েনি, পড়েছে একদিকে। এটাও গোপী ডাক্তারের পক্ষে একটা সমস্যার বিষয়। মানুষের মুখ না দেখতে পেলে মেজাজ বোঝা যায় না। এই হারামজাদা মিনিট দশ হল চুপ করে বসে আছে। এটা ভয়ের। খারাপ কিছুর আগে সব থম মেরে থাকে। ছোবলের আগে সাপ, ঝড়ের আগে বাতাস, এমনকী মৃত্যুর আগে নিঃশ্বাস পর্যন্ত।

'দেব মুড়কি? দিই একটু?'

মুড়কি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কাদু শান্ত গলায় বলে, 'ডাক্তার, তুমি আছ কেমন?'

গোপীনাথ থতমত খেয়ে যায়। এই প্রশ্ন সে আশা করেনি। খারাপ লোকের কাছ থেকে ভাল প্রশ্ন ভাল কথা নয়। গোপীনাথ ঢোঁক গিলে, ফ্যাকাসে হাসে। বলে, 'ভাল আছি বাবা। খুবই ভাল আছি। ঝিলডাঙা এমন চমৎকার গ্রাম। মানুষগুলো এমন সুন্দর, ভাল না থেকে উপায় আছে?'

কাদু হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গি করল। বলল, 'ভাল তো থাকবেই। লাইসেন্স ছাড়া ডাক্তারির এমন চমৎকার ব্যবসা ফেঁদে রেখেছ, ভাল থাকবে না?

মুখ্যসুখ্যু মানুষকে বোকা বানাছো। ডাক্তারি ব্যবসা কি আর চাট্টিখানি ব্যবসা? বুঝলে গোপীনাথ লাইসেন্স ছাড়া সবকিছুই ভাল। এই ধরো না, ওই যে মোহন, ওই যে তোমার দোকানের বাইরে এখন দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছো? ওই তো, আরে বাবা একটু মুখ বাড়িয়ে দেখ না। ওই শালার কাছে একটা মেশিন আছে। ছোট মেশিন। কিন্তু সেই রিভলবারও তোমার লাইসেন্স ছাড়া রেখেছি। ওই জিনিসও ভাল। পেটে একটা ভরলেই সাবাড়।'

গোপীনাথের গলা শুকিয়ে আসে। এই ছেলে কি তার সঙ্গে বড় ধরনের কোনও ঝামেলা করতে এসেছে?

'তারপর ধরো মেয়েছেলে। লাইসেন্স ছাড়া কারবার করলে মেয়েছেলের টেস্ট হয় অন্যরকম। লাইসেন্স মেয়ের টেস্ট যদি হয় ঝাল, লাইসেন্স ছাড়া হবে নোনতা নোনতা। হ্যা হ্যা। তবে কী জানো ডাক্তার, লাইসেন্স ছাড়া কাজকম্মে ঝক্কি আছে। কোনওভাবে ধরা পড়ে গেলে সমস্যা। পুলিশ তোমার পিছনে এতখানি ঢুকিয়ে বসে থাকবে। বসে বসে বিড়ি ফুঁকবে। তুমি যতই বলো

না কেন বের করবে না, ফুসফুস করে দারোগাবাবু বিড়ির ধোঁয়া ছাড়বে।'

হাতের অশ্লীল ইঙ্গিত করে কথা শেষ করল কাদু। আবার হাসল বিশ্রি আওয়াজে।

গোপীনাথ হাত তুলে ঘাড়ের ঘাম মুছল। বিড়বিড় করে বলে, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা। সমস্যাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

কাদু বকের মতো গলা বাড়িয়ে নিচু গলায় বলল, 'ডাক্তার, সদানন্দের ছেলের বউয়ের কী হয়েছে গো?'

মানুষের চোখের মণি যখন স্থির হয়, তখন দুটো চোখের মণিই স্থির হয়। একমাত্র শয়তানের বেলায় ঘটে অন্যরকম। তাদের একটা মণি থেমে থাকলেও অন্যটা নড়ে। গোপীনাথ দেখল, কাদুর বাঁদিকের চোখের মণি স্থির। অন্যটা পাক মারছে!

গোপীনাথ ভেবেছিল ঢোঁক গিলবে। হল না। আতঙ্কে থুতুও শুকিয়ে গিয়েছে। যন্ত্রের গলায় বলল, 'ফিট গিয়েছে। মৃগী রোগ হলে এমনটা হয়। ঘন ঘন ফিট যায়। নোংরা গন্ধ দিয়ে জ্ঞান আনতে হয়।'

কাদু চাপা গলায় ধমক দিল।

'থাম, চুপ করো। ওসব মৃগী ফৃগী নয়। সদা হারামজাদার ছেলের বউয়ের কী হয়েছে আমি ঠিক করব, তুমি নয়। আমি যা বলব কাল থেকে তুমি গাঁয়ে সে কথাই রটাবে। বুঝেছ?'

'কী কথা?'

গোপীনাথ বলল বটে, তবে তার মনে হল না পুরো কথা মুখ দিয়ে বেরলো। ভয়ের সময় এরকম হয়। মানুষ কথা বলে, কিন্তু পুরো কথা বেরোয় না।

'সেটা বলতেই তো এতদূর এলাম গো ডাক্তার।'

কাঁদু নিঃশব্দে হাসল। অন্ধকারে তার নোংরা দাঁতগুলো দেখা গেল না। মনে হল, দাঁত, জিব, ঠোঁটের বদলে খানিকটা অন্ধকার মুখে সাজিয়ে বসে আছে সে।

পরের এপিসোড আগামী রোববার

ছবি শান্তনু দে

সে
সেন
সলিউশনস

হাত বাড়ালেই রাইমা। খুচখাচ ঝামেলা, টুকটাক সমাধান। একটু বন্ধুত্ব আর অনেকটা বিশ্বাস। চিন্তা কীসের, আপনার কাছে রাইমা আছে

আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি। মেয়েটি কলেজে পড়ে, আমি চাকরি করি। সমস্যা হল, মেয়েটি আর আমার সঙ্গে রিলেশন রাখতে চাইছে না। বলছে, ওর বাড়িতে নাকি আমাদের রিলেশনের কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। ওকে নাকি সবাই প্রচণ্ড বকাবকি করছে, তাই সে আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। ফোন করা, মেসেজ পাঠানো, সব বন্ধ করে দিয়েছে। আমি বলেছিলাম যে, ওকে আমি বিয়ে করতে চাই, তারপরেও বলছে, আমার সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ রাখবে না। আমার কোনও কথাই ও শুনতে চাইছে না। আমি বুঝতে পারছি না, ওর বাড়িতে সত্যিই কি কোনও প্রবলেম হয়েছে, না ওর আর আমাকে ভাল লাগছে না বলে, এরকম করছে!

—নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

আমার মনে হয়, মেয়েটি তোমার সঙ্গে আর রিলেশন রাখতে চাইছে না। আর সেটা তুমি নিজে, কিছুটা হলেও, বুঝতে পেরেছ। কাজেই কষ্ট হবে জানি, তবুও বাস্তবটা তো মেনে নিতেই হবে! আবার, এও হতে পারে বাড়িতে বকাবকি করায়, ও ভয় পেয়ে গিয়েছে! চেষ্টা করো, একবার যে কোনও উপায়ে ওর সঙ্গে দেখা করে, সত্যিটা

জানতে। কোনওরকম রাগারাগ করে নয়, ঠান্ডা মাথায় খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করো, ও কেন এরকম করছে। বাড়ির চাপে? না ও-ই আর চাইছে না, রিলেশন কন্টিনিউ করতে। আবারও যদি নেগেটিভ রেসপন্স পাও মেয়েটির থেকে, তাহলে তোমার বেরিয়ে আসা ছাড়া, আর কোনও উপায় নেই!

আমি দশম শ্রেণিতে পড়ি। আমার সমস্যা হল, যে কোনও মেয়ে দেখলেই, আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। মনে হয়, একে ছাড়া আমি বাঁচব না। কিন্তু পরে যখন আবার অন্য কোনও মেয়েকে দেখি, তখন তাকে দেখেও একই অবস্থা হয়! কীভাবে যে এটার হাত থেকে মুক্তি পাব, জানি না। প্লিজ হেল্প।

—রিকি রায়, টাকি

তুমি তো ক্লাস টেন-এ পড়, এখনই এই অবস্থা! শোনো, মন দিয়ে পড়াশোনা করো। প্রেম-ট্রেম পরে হবে। তবে এই বয়সে মেয়ে দেখলে ইনফ্যাচুয়েশন হওয়াটা স্বাভাবিক। এটা একটা নেশার মতো। এটাকে মাথায় চড়তে দিও না। আর প্রকৃত ভালবাসা এত সহজে হয় না। রোজ যখন পাত্রীটি বদলে যাচ্ছে, তখন দুশ্চিন্তা করো না। এটাকে জাস্ট এনজয় করো। কিন্তু ভুলেও সত্যিকারের প্রেম প্রেম খেলা খেলো না।

আমার সমস্যা তিনটি। এক, আমার মাথার সামনের দিকের সমস্ত চুল পড়ে যাচ্ছে। দুই, আমার স্কিন খুব অয়েলি। ফলে ঘাম হলে, আরও বেশি তেলতেলে লাগে মুখ। তিন, শীতকালে সারা শরীরে সাদা স্পট পড়ে যায়। কীভাবে এগুলো সারবে, বলে দাও, প্লিজ।

—দীপ. সন্দেশখালি

তোমার প্রথম সমস্যার উত্তরে বলি, চুল পড়ে যাওয়ার অনেক কারণ থাকে। তুমি যদি খুব জাঙ্ক বা অয়েলি খাবার খাও, তাহলে চুল পড়তে পারে। তার জন্য তোমার ঠিকমতো ডায়েট মেইনটেন করা উচিত। আর চুল পড়া বন্ধ করার জন্য একটা হোম রেমিডি বলে দিচ্ছি, ট্রাই করে দেখতে পার। জবা ফুলের কুঁড়ির নীচের অংশটা ভেঙে তার আঠাটা যদি চুলের গোড়ায় লাগাও, তাহলে উপকার পাবে। এবার দ্বিতীয় সমস্যার উত্তরে বলি, তুমি শশা গ্রেট করে ফ্রিজে রাখবে। লাইম ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে, ঠান্ডা শশায় দু'ফোঁটা নেরালি অয়েল মিশিয়ে সারা মুখে লাগাবে। আধ ঘণ্টা পর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে নেবে। দিনে অন্তত একবার করলে উপকার পাবে। বাইরে বেরবার আগে মুখে বরফ ঘষে নেবে। এতে ঘাম কম হবে। আর সবশেষে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি, আমি যেহেতু ডাক্তার নই, তাই একজ্যাক্টলি বলতে পারব না, তোমার কী হয়েছে। তাই না জেনে কিছু বলা সম্ভব নয়। তুমি এর জন্য ডাক্তার দেখাও।

আমি চাকরি করি। বয়স ছাব্বিশ। আমার সমস্যা, আমার দাদাকে নিয়ে। দাদা আমার থেকে তিন বছরের বড়। আমার সব ব্যাপারে দাদা ইন্টারফেয়ার করে। বোঝে না যে, বোনের একটা নিজস্ব জগৎ থাকতে পারে। যখন তখন আমার মোবাইল নিয়ে ঘাটাঘাটি করবে। বারণ করলে ভুল বুঝবে, আর আজেবাজে কথা বলবে। দাদা ভাবে, আমি এখনও সেই বাচ্চাটি আছি। আমার ফোন আসলেই, দাদা সবসময় জিজ্ঞাসা করবে, কে ফোন করল? কেন ফোন করল?—ইত্যাদি। আমি দিনের পর দিন এইসব প্রশ্নবাণে জর্জরিত।

—মৌ মুখার্জি, হাওড়া

আমার মনে হয়, তোমার ব্যাপারটাকে ট্যাক্টফুলি হ্যান্ডেল করা উচিত। এমনভাবে বোঝাও দাদাকে, যাতে দাদা তোমার সমস্যাটা রিয়ালাইজ করে, আবার অফেন্ডেড না হয়। আর তাছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্টবক্তা হওয়া ভাল। আসলে দাদাদেরও বোঝা উচিত, বোনেদের প্রাইভেসিতে ইন্টারফেয়ার করা উচিত নয়। কেয়ারিং হওয়া ভাল, কিন্তু সেটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে মুশকিল। কাজেই ভদ্রভাবে সোজা কথায়, স্পষ্ট করে কোনও কথা বুঝিয়ে বলাটা, আই থিংক, ইট'স বেটার।

এই ঠিকানায় লিখো—সেন সলিউশনস, রোববার, সংবাদ প্রতিদিন ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭২

ভালো টি চাখিব

পার্ক স্ট্রিটের চা বাগান। অক্সফোর্ড-এর চা-বার। অলস দুপুর নিমেষে কাবার। আরও এক কাপ, আবার।

জয় গোস্বামী

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হচ্ছে, আর আপনি এই বুকর‍্যাক থেকে থেকে ওই বুকর‍্যাকের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন। হাতে তুলে নিচ্ছেন এক একটা নতুন ঝকঝকে না-পড়া বই। প্রথম পাতা থেকে দ্বিতীয় তৃতীয় পাতায় ভেসে যাচ্ছে চোখ, শেষে বই হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছেন পাশের চা-বারে। কোনও একটা টেবিলে বসে পড়তে শুরু করছেন। চোখ তুলে মাঝে মাঝে দেখছেন নীচে, স্বচ্ছ কাচের বাইরে ফুটপাথে পথচারীদের যাওয়া আসা। অন্তরাল থেকে নরম আওয়াজে কানে আসছে সেতার। অলক্ষ্য সেই সুর এসে আরও নিবিড় ও ঘন করে তুলছে আপনার পাঠ মুগ্ধ মন। বই থেকে চোখ না সরিয়েই হাত বাড়িয়ে আপনি তুলে নেবেন বলে অপেক্ষা করছে টেবিলে চায়ের কাপ।

যে কোনও দুপুর বা অপরাহ্নে পার্ক স্ট্রিটের অক্সফোর্ড বই ঘরে ঢুকে কাঠের সিড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সংলগ্ন চা-বারের দিকে তাকান। কোনও একটি টেবিলে, কোনও একজন আপনাকে, দেখতে পাবেন আপনি। নিবিষ্ট মনে যিনি গ্রন্থ পাঠরত। সামনে চায়ের পট। প্লেটের উপর কাপ।

অবশ্য ওই একবার দেখে, প্রথমে, আপনি ধারণাও করতে পারবেন না যে, এখানে, অন্তত একশো তিরিশ রকমের চা পাওয়া যায়। সাউথ অ্যাফ্রিকান টি, চাইনিজ টি, জ্যাপানিজ টি, ফ্রুট অ্যান্ড হার্ব টি। এত রকমের চা যে জগতে আছে তা কি আপনি জানতেন! সাউথ

আফ্রিকান টি-তে পাওয়া যাবে স্মোকি ফ্লেভার। কৃশাণু নামে যে যুবকটি চা বানান এখানে, তার কাছে হয়তো এই সাউথ অ্যাফ্রিকান টি সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করলেন আপনি। তিনি ছোট প্লেটে করে আপনার সামনে রাখলেন সেই চা পাতা। নাকের কাছে তুলে গন্ধ নিন। একেবারে টোব্যাকোর গন্ধ!

দেখতেও অনেকটা পাউচে ভরা তামাকের মতো। যেন সিগারেটের কাগজে পাকিয়ে নিলেই হয়। আবার লেমন গ্রাস নামে যে চা, তা কিন্তু মোটেই কোনও চা পাতা নয়। তা মূলত একরকম ঘাস। আর দেখতেও একেবারে লম্বা লম্বা ঘাসেরই মতো। ওই তামাকের মতো দেখতে সাউথ অ্যাফ্রিকান টি কিন্তু খেতে হবে মধু দিয়ে। এক পট চায়ে দেড় চামচ মধু। এবং মাদার অ্যান্ড চাইল্ড স্পেশাল টি-ও কিন্তু মধু দিয়েই খেতে হয়। এখানে পাওয়া যায় কাশ্মীরি কাওয়া নামক একরকম চা, যার গন্ধ কিছুটা গরম মশলার মতো, সেই চা পান করলে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় বলে আপনি জানতে পারবেন এখানকার হেড অফ দি অপারেশন, অর্ণব পাণ্ডের কাছে। আপনি জানতে পারবেন এখানে মশালা টি-ও পাওয়া যায়, যা ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুব প্রিয়, এবং সেই চায়ের জন্য বিশেষভাবে রাখা হয় বিভিন্ন ধরনের গুঁড়ো মশলা। আপনি মজা পাবেন মশালা টি পরিবেশন করার পাত্রটি দেখে। ছোট ছোট কাচের গেলাস ধরে আছে এক-একটি ধাতুনির্মিত হনুমান। অনেকে নাকি এই গেলাস সহ হনুমান কিনতেও চান এঁদের কাছে। তবে আপনি নিশ্চিত অবাক হবেন, অর্ণব পাণ্ডের কাছে একটি তথ্য জেনে। এখানে, এসে যদি কেউ কার্ড দেখে মরক্কো-র চা অর্ডার করেন, তবে তাঁকে চা পরিবেশন করা হবে সেই বিশেষ ধরনের কাপ প্লেটে যা মরক্কো থেকে আনানো হয়েছে। অর্থাৎ কিছুক্ষণের জন্য আপনি মরক্কোবাসী হয়ে গেলেন। ধরুন, আপনি কোনও চিনা চা খেতে চাইলেন, যেমন উলং টি, কেমন? তাহলে আপনাকে চাইনিজ কাপ প্লেটে সার্ভ করা হবে। অর্ণব আপনাকে জানাবেন, চিন দেশের, উলং ভ্যালি থেকে আসে এই চা। সঙ্গে সঙ্গে যেন আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে আপনার অদেখা গাঢ় সবুজ এক উপত্যকা। কাপ ভর্তি গ্রিন টি-র দিকে তাকালে আপনি যেমন চায়ের স্বাভাবিক লিকার-রং ছাপিয়ে সবুজ একটি আভা দেখতে পান তেমনই এই শহর ছাড়িয়ে আপনার চোখে ভেসে উঠবে উপত্যকার সবুজ রৌদ্ররঙ।

এইভাবেই আপনার চোখে আমাদের দার্জিলিং-এর চা বাগান ভেসে উঠতে পারে যদি আপনি চান দার্জিলিং গোল্ড ফার্স্ট ফ্লাশ চা। এই চা প্রধানত বিদেশে পাঠানো হয়। তাই এর দাম একটু বেশি। কতটা বেশি? ৫০০০ টাকা কেজি। এখানে অবশ্য পাওয়া যায় এক কাপ ৪৫ টাকায়।

এই চায়ে একবার চুমুক দিলেই আপনি মোহিত হয়ে যাবেন। মরক্কো বা দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে আর মন যাবে না। যদিও ২০ টাকা থেকে ৭০ টাকায় একশো তিরিশ রকমের চা আপনি পাবেন এখানে। কিন্তু দার্জিলিং গোল্ড ফার্স্ট ফ্লাশ-এর তুলনা নেই। মৌ সেন মুখার্জি, যিনি এঁদের পাবলিক রিলেশনস দ্যাখেন, তিনি আপনাকে জানাবেন যে এই চা বোনা হয় পাহাড়ের অনেক উঁচুতে। ভাবুন, হয়তো এভারেস্ট যাওয়ার রাস্তায়, আশেপাশে, তার একটু নিচুতে জন্মেছে এই চা পাতা।

ওদিকে বিকেল পার হয়ে সন্ধে হচ্ছে, আপনি দেখবেন ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা এসে বসছে। কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে একে অন্যকে। ভিড় হতে শুরু করেছে। আপনি টেবিল থেকে উঠে তখন এগিয়ে যাবেন বই হাতে, ওই কোনায় রাখা সোফার দিকে। বসে পড়বেন। সোফার নরম আপনাকে টেনে নেবে। আপনি বই কিনবেন কী কিনবেন না, কেউ জিগ্যেস করবে না। না কিনলেন। তাতে কী। ওদিকে বই হাতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়বেন আপনি। কতক্ষণ পার হয়ে যাবে। কেউ যেন ডাকবে আপনাকে। কে? এই চা-বারের কোনও পরিচিত কর্মী। রাত হয়েছে। দোকান বন্ধ হবে যে।

এক কাপ দার্জিলিং গোল্ড ফার্স্ট ফ্লাশ বানাতে লাগবে

দার্জিলিং গোল্ড ফার্স্ট ফ্লাশ চা পাতা—১½ চা চামচ
জল—১ বড় কাপ
চিনি—১ ছোট চামচ

এবার

প্রথমে একটা পাত্রে জল গরম করে নিন। আর যদি মাইক্রোআভেনে করেন তবে ৮০-৯০ ডিগ্রিতে জল গরম করুন। জল গরম হলে চা পাতা দিয়ে মিনিট দু'য়েক ভিজিয়ে রাখুন।

এবার একটা সুন্দর বড় কাপে চিনি দিন। চা ছেঁকে পরিবেশন করুন।

এক কাপ মসালা টি বানাতে লাগবে

আসাম টি—১ চা চামচ
দুধ—১১/২ চা চামচ
চিনি—স্বাদমতো
দারচিনি—১টা ছোট টুকরো
ছোট এলাচ—১টা
আদা—১ কুচি
গোল মরিচ গুঁড়ো—১ চিমটে

এবার

প্রথমে একটা পাত্রে জল গরম করুন। অল্প গরম অবস্থায় সমস্ত মশলা দিয়ে দিন।

এবার জল ফুটে গেলে দুধ আর চিনি মেশান। চায়ের পাতা দিয়ে আর একবার ফুটিয়ে নিন।

সুন্দর একটা চায়ের গ্লাসে চা ছেঁকে পরিবেশন করুন।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

Approach Roads & Bridges

Multi-product SEZ's

Several Small & Medium Scale Enterprises

Health, Education & Residential Developments

Over 17 lakh job opportunities

Coming Soon

NKID

A City of New Opportunities

A City of New Opportunities

For the growth and transformation of the economic and social landscape of West Bengal.

unitech Dream. Believe. Create.

Chowringhee Court, 4th Floor, 55 & 55/1, Chowringhee Road, Kolkata – 700 071
033-40026160

taste
balance
Experience Seagram's Blenders Pride Magical Nights events.
O&M 0553
Seagram's
BLENDERS
PRIDE
MAGICAL NIGHTS
Taste that speaks for itself